পৌষ-পার্ব্বণ

উপন্যাস

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দাম দুই টাকা

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার বি-এস, সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ভাদ্র ১৩৩৮ সাল

প্রিণ্টার—শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ
নিউ সরস্বতী প্রেস
২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পৌষ-পার্ব্বণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কয়লা-কুঠির পৌষ-পার্ব্বণ। তিনদিন ধরিয়া সাঁওতাল কুলিদের 'বাঁদ্‌না' উৎসব চলিতেছিল।

প্রবাদ আছে, এইদিন দামোদর নদীতে স্নান করিলে নাকি তাহাদের সমস্ত পাপক্ষয় হয়; তাই গত রাত্রে যাহারা দামোদরে গিয়াছিল, রাত্রি তৃতীয় প্রহরে স্নান করিয়া এতক্ষণে 'সিরিং' গান গাহিতে গাহিতে তাহারা ফিরিয়া আসিল। যাহারা দামোদরে যায় নাই, তাহারা খাদ্‌-পুকুরের ঠাণ্ডাজলে স্নান করিয়া উঠানে বসিয়া মদ খাওয়া সুরু করিয়াছে। দূরে চার-নম্বর কুলি-ধাওড়ার কোঁড়া কুলিগুলা, মেয়েদের হাত ধরাধরি করিয়া

মাদল বাজাইয়া গান গাহিতেছে।—

—বোম্ ভোলা ভোলানাথ,
সব কাজেই করে' বসে ভুল রে—
সব কাজেই করে' বসে ভুল!

সঙ্গে আছে মড়ার মাথা,
বাঘ-ছালের আসন পাতা,
কানে গোঁজা ধুতুরারি ফুল গো—
(ও তার) কানে গোঁজা ধুতুরারি ফুল!

নেশা খেয়ে আঁখি ঢুলু ঢুল্ গো—
নেশা খেয়ে আঁখি ঢুলু ঢুল্!

সাঁওতাল-কুলিদের বাগান-ধাওড়ার পাশে একঘর বাউরী বাস করিত। সেখানে থাকিত লখাই, তার স্ত্রী আমোদী, আর একটা কুড়াইয়া-পাওয়া মেয়ে—লোট্নী। একটা ছেলে ছিল, সেও আবার গত বৎসর কয়লা-খাদে কাজ করিতে গিয়া মরিয়াছে। লখাই ভাবিয়াছিল, লোট্নীর সঙ্গে ছেলেটার বিবাহ দিয়া তাহারা চারজনে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিবে, কিন্তু বিধাতা বাধ সাধিলেন। ছেলেটা মরিবার পর হইতে তাহাদের সংসারের অবস্থাও বেশ একটু অসচ্ছল হইয়া

পড়িয়াছিল। লখাই দিনরাত মনের দুঃখেই থাকে; খাদে 'টালোয়ানী' করিয়া যাহা রোজগার করে, তাহাতে কোনরকমে তাহাদের দিন চলিয়া যায়।

লোটনী কাল হইতে সাঁওতালদের 'বাঁদ্না-পরব' দেখিবার জন্য ব্যানার্জ্জি-সন্তানের কুলি-ধাওড়ায় চলিয়া গেছে। ছেলেটা যখন বাঁচিয়া ছিল, আমোদী তখন এই পৌষ-সংক্রান্তির মকর উৎসবে কতই না ফুর্ত্তি করিয়াছে, এখন আর সে-সবে তাহার মনও নাই, তাহার উপর কয়েকদিন ধরিয়া লখাইএর জ্বর আসিতেছিল, কাজেই সে ঘরের বাহির হইতেও পায় নাই। সকালে উঠিয়া মনে করিয়াছিল, উনানে একথালা ভাত ফুটাইয়া লইয়া সম্বৎসরের সাধ, আজ একটু আমোদ-আহ্লাদ করিবে। সাঁওতালদের গান শুনিতে শুনিতে কয়লায় আগুন ধরাইয়া ঘরের ভিতর চাল আনিতে যাইবে, এমন সময় দেখিল, জ্বরের তাড়নায় লখাই বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে এবং বিছানার উপরেই খানিকটা বমি করিয়া রাখিয়াছে।—আমোদী তাড়াতাড়ি বিছানাটা পরিষ্কার করিয়া, স্বামীকে একটু সরাইয়া দিয়া বলিল, —এই! ওদিকে সরে' শু।

লখাই একবার আঃ বলিয়া পাশ ফিরিল।

আমোদী চীৎকার করিয়া বলিল,—ই এক জ্বালা হলো দেখ্‌ছি। তুই এবাঁরে মরে' গেলেই খালাস্ পাই আমি।...... আর সে লুটনী হারামজাদীও তেম্‌নি। কাল থেকে গেল, এখনও ফির্‌বার নাম নাই।......আসুক একবার, দেখাচ্ছি মজা।

আমোদীর চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, লোটনীকে পাইলে সে হয়ত খুন করিয়া ফেলিবে।

হাঁড়িতে চাল আনিতে গিয়া দেখিল, চাল নাই।—ক'দিনই বা থাকিবে? চারদিন লখাই কাজ করিতে যায় নাই, তাহার উপর একজনের রোজগারে দু'জন বসিয়া বসিয়া খাইতেছে।

আমোদী বাহিরে আসিয়া দেখিল, সাওতাল, কোঁড়া ইত্যাদি তাহার প্রতিবেশীরা আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে, মদ খাইতেছে, নাচিতেছে এবং গান গাহিতেছে। তাহার কাছে এ-সব বিষের মত মনে হইতেছিল।

আমোদী ধীরে-ধীরে কুঠির ডাক্তারখানায় গিয়া বসন্তবাবুর কাছ হইতে স্বামীর জন্য একশিশি 'দাওয়াই' চাহিয়া বলিল,—একদিনেই ভাল করে' দিতে হবেক্ ডাক্তারবাবু। তুর্ পায়ে পড়্‌ছি ডাক্তার, ভাল ওষুধ দিস্।

ঔষধ লইয়া আমোদী ঘরে ফিরিতেছিল, পথে মনে পড়িল, স্বামী না-হয় আজ কিছু খাইবে না, কিন্তু তাহার নিজের পেট্‌টা তো কোন রকমে ভরাইতে হইবে ! আবার সে লোটনী হারামজাদী যদি আসিয়া হাজির হয়, তাহারও পিণ্ডি চট্‌কাইবার ভার যে তাহারই উপর !......কি করিবে সে ? আজ এই পরবের দিনে কাহার কাছে গিয়াই বা সে হাত পাতিবে ? আর হাত পাতিলেই যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ভাবনা ছিল না।

বাবুদের সরকারী বাসায় নরু বলিয়া বহুকালের এক চাকর ছিল। সে তাহাকে চিনিত। আমোদী তাহার কাছে গিয়া নিতান্ত ভিখারিণীর মতই কহিল, নরু ভাই, আমাকে আধসের-খানেক্ চাল দিতে পারিস্ ?

কুঠির ম্যানেজার বাবু সুমুখের ঘরের মেঝের উপর একটা 'ইজি চেয়ারে' হেলান্ দিয়া শুইয়াছিলেন। তিনি বোধহয় কথাটা শুনিতে পাইলেন, কহিলেন,—নরো, ও কি বল্‌ছে রে ?

—আধসেরটাক্ চাল চাইছে।

কুঠির হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা স্বয়ং ম্যানেজারবাবু চোখের সুমুখে বসিয়া রহিয়াছে, অথচ মাগী কি না তাঁহাকে কিছু না বলিয়া

ভৃত্যের নিকট চাহিতে গেল! তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—খবর্‌দার্‌ নরো, আমার হুকুম ছাড়া কাউকে এক ছটাক চাল দাতব্য কর্‌তে পাবি না। এটা দানছত্র পেয়ে গেছিস্‌ বুঝি? বলিয়া একটুখানি থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, লখা হারামজাদা তো আজ পাঁচদিন থাদের পাশ ঘেঁসেনি আর, সেদিন ওই লুট্‌নী-হারাম্‌জাদীকে বল্‌লুম আমার বাসার এঁটো বাসন ক'টা মেজে দিয়ে যা, তা আর দেওয়া হলো না। আজ কিনা এসেছেন চাল চাইতে,—এ্যাঁ!

তিনি দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া আরও কি যেন বলিতে যাইতে-ছিলেন। অভিমানে আমোদীর চোখ দিয়া তখন জল গড়াইতেছে। গরীব হইলেও সে এমন করিয়া কোনদিন কাহারও কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসে নাই। আজ নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহাকে আসিতে হইয়াছিল। সে কোন কথার প্রতিবাদ না করিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ঘরে আসিয়া দেখিল, লখাই বিকারের ঘোরে সারাঘর গড়াইয়া গড়াইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে আর আপন-মনে কত কি বলিয়া যাইতেছে।

শিশি হইতে কাঁসার বাটিতে একদাগ ঔষধ ঢালিয়া, আমোদী তাহার মুখে দিতেই ঔষধটা গোয়ালি বাহিয়া গড়াইয়া আসিল, পেট পর্য্যন্ত পৌঁছিল না।

আমোদী ভাবিল, একবার ডাক্তারবাবুকে দেখাইলে ভাল হয়।

ডাক্তারবাবু 'বাইসাইকেল্' লইয়া অন্যত্র যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময় আমোদী আসিয়া ধরিয়া বসিল, একবার যেতে হবেক্ ডাক্তারবাবু।

বসন্ত-ডাক্তার নিজের কাজ সারিয়া মাত্‌লা-ধাওড়ায় আরও দুইটা রোগী দেখিয়া অপরাহ্ণ-বেলায় যখন আমোদীর ঘরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আমোদী লখাইয়ের জীবনের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, বিছানার পাশে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। ডাক্তার দেখিল, তাহার শ্বাস উঠিতেছে। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই, লখাই তাহার মাথাটা বারকতক এদিক-ওদিক করিয়া একবার ডাক্তারের দিকে একবার আমোদীর দিকে তাকাইয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া খাপ্‌চি খাইতে লাগিল। নিষ্প্রভ চোখের কোণ বহিয়া দর্ দর্ করিয়া অশ্রুর ধারা নামিয়া আসিল এবং পরক্ষণেই বক্ষের স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল।

আমোদী নিরুপায়। ডাক্তারবাবুর পা-দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, আমি কি করব বাবু, আমার যে আর কেউ নাই!

এই নিঃসহায়া কুলি-রমণীর কাতর ক্রন্দন শুনিয়া ডাক্তারের চোখ দু'টাও জলে ভরিয়া আসিল। শবদাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কয়েকজন কোঁড়া ও সাঁওতাল কুলিকে বলা হইল, কিন্তু আজ উৎসবের দিন, তাহারা কেহই যাইতে রাজি হইল না। অবশেষে বসন্তবাবু নিজে বাইকে চড়িয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া জনকতক চামার মাল-কাটা দিয়া লখাইএর শবদাহের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

আমোদী তাহাদের সঙ্গে নিজেও একবার শ্মশানে যাইতে চাহিল, কিন্তু ডাক্তারবাবু তাহাকে যাইতে দিল না।

আমোদী নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাত্রিটা কোনরকমে কাঁদিয়া পার হইল কিন্তু পরদিন কিছু না খাইয়া তাহার আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না। অথচ, ঘরে এক মুঠা চা'ল নাই,—কি করিবে? খাদে কাজ সে কোন দিনই

করে নাই। সে যদি-বা কাজ করিতে চাহিয়াছে, লখাই তাহাকে কোনদিন কাজ করিতে দেয় নাই।

ঘরে একটা কাঁসার থালা আর গোটাকতক পিতল-কাঁসার ভাঙ্গা গেলাস বাটি ছাড়া কিছু ছিল না। থালাটা বিনোদ ময়রার দোকানে আট আনায় বন্ধক রাখিয়া আমোদী চার আনার চা'ল কিনিল। বাকী চার আনা পয়সা বিনোদ তাহার আগেকার পাওনা দরুণ কাটিয়া লইল।

আধসের চালে তাহার না হয় একটা পেট দুবেলা চলিতে পারে, কিন্তু লোটনী আসিলে তো চলিবে না! তাহাকে ছাড়িয়াও তো সে থাকিতে পারিবে না,—আহা, সে তার মা-বাপ জানে না, কোথায় হয়ত' এতদিন না খাইয়াই মারা যাইত। সে যে তাহাকে নিজের মেয়ের মত আদর-যত্নে এত বড়টি করিয়া তুলিয়াছে। মায়ের স্নেহ দিয়া যাহাকে সে ভালোবাসিয়াছে, তাহাকে ভুলিতে পারা বড় সহজ কথা নয়।

সন্ধ্যার সময় বাকী একপোয়া চা'ল উনানে চড়াইয়া দিয়া, আমোদী কাঁদিতেছিল আর ভাবিতেছিল, যে-স্বামীকে সে চিরকাল গালাগালি দিয়াছে, এমন-কি মরণের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত

যাহাকে 'মরিয়া যা' বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছে, তাহার অভাব আজ তাহাকে যে এমন করিয়া পথের কাঙালিনী সাজাইয়া এতখানি আঘাত দিতে পারে, সে-কথা তো সে একটি দিনের জন্যও ভাবিতে পারে নাই।

ভাতগুলা ফুটিয়া উঠিয়াছিল; এমন সময় দেখিল, সুমুখে বড়্‌ধনা ক্ষেতের পাশ দিয়া আধ আলো-অন্ধকারে গা ঢাকিয়া হাসিতে হাসিতে হেলিয়া দুলিয়া লোটনী সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে।

তাহাকে হাসিতে দেখিয়া আমোদীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; রাগে অধৈর্য্য হইয়া উঠানের উপর হইতে একটা বড় কয়লার ঢেলা তুলিয়া লইয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল,—ঘর ঢুকতে হবেক্ নাই হারামজাদী,—বেরো বল্‌চি।

বাড়ীতে ঢুকিবার পূর্ব্বেই লোটনী যে এমন অভ্যর্থনা পাইবে, তাহা সে আশা করে নাই। কয়লার চাংড়াটা তাহার বুকের উপর এমন জোরে আসিয়া লাগিল যে, সে 'উঃ মা গো' বলিয়া, বুকে হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।—কিন্তু আমোদী তখনও থামে নাই। আবার আর-একটা চ্যালা কাঠ লইয়া তাহারই দিকে সে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া লোট্‌নী তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

উনান হইতে ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া কয়েকটা শালপাতায় ঢালিয়া, সেই এক পোয়া চালের ভাত, দুই ভাগ করিয়া আমোদী ডাকিল, লোটন্ !

ভাবিয়াছিল, লোটনী হয়ত' অন্ধকারে ঘরের পাশেই কোথাও লুকাইয়া আছে, খাইবার সময় ডাকিলে নিজে হইতেই আসিবে। কিন্তু তাহার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া আমোদী ভাবিল, মার খাইয়া হয়ত তাহার অভিমান হইয়াছে, তাই সে সাড়া দিল না।

কেরোসিনের ডিবেটা হাতে লইয়া আমোদী তাহার ঘরের চারিপাশ ভাল করিয়া দেখিল, আম-বাগানটা তন্ন-তন্ন করিয়া সন্ধান করিল, কোথাও লোটনীকে দেখিতে পাইল না। তিন চার বার তাহার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, কোন উত্তর পাইল না।

অবশেষে নিরাশ হইয়া ঘরে ফিরিতেই যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনে হইল, নিজের মাথাটা পাথরের উপর ঠুকিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। লোটনীকে খুঁজিতে যাইবার সময় এমনি অন্যমনস্ক হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল যে, ঘরে ভাত বাড়িয়াছে, অথচ শিকলটা টানিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া যায় নাই। দেখিল,

ইহারই মধ্যে, সাঁওতালদের একটা কালো কুকুর কোন্ সময় ঘরে ঢুকিয়া পাতা-ত্নইটা একেবারে পরিষ্কার করিয়া দিয়া মুখ চাটিতে চাটিতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

—'ওমা, এই রাক্ষুসে' খাল্‌ভরা কল্লেক্ কি গো'—বলিয়া আমোদী তাহার হাতের জলন্ত ল্যাম্প্‌টা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিতেই ডিবের সমস্ত কেরোসিনটুকু উঠানে পড়িয়া দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কুকুরটা কাঁই কাঁই করিয়া ছুটিয়া পলাইল।

আমোদী অন্ধকারেই মাটির কলসি হইতে ফুটা একটা বাটির উপর কয়েক বাটি জল ঢালিয়া পেটের জ্বালায় ঢক্ ঢক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়া জড়সড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে আমোদী কি করিবে তাহাই ভাবিতেছে। বাবুদের চাকর নরু সেই পথ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল, আমোদীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল,—লোটনী কোথা, আমোদী ?

—কেনে ?

—আজ থেকে সে আমাদের বাসায় কাজ কর্‌বেক্ বলেছে।

আমোদী একটা ঢোঁক্ গিলিয়া বলিল, কখন্ বল্‌লেক্ ?

—কা'ল সন্ধ্যাবেলায় বলে' এলো যে !...পাঠাই দিস্ তাকে, ভাত দিব।

আমোদী জিজ্ঞাসা করিল, আমি গেলে চল্‌বেক নাই রে নরু?

—তবে তুঁই-ই যাস, বলিয়া নরু চলিয়া গেল।

...এদিকে সারারাত্রি উপবাস করিয়া, এস্.চৌধুরীর একটা কুলি-ধাওড়ার চালায় লোটনী কোন রকমে শীতের রাত্রিটা কাটাইয়া পরদিন ভাবিতেছিল, সে ঘরে ফিরিয়া যাইবে, কি যাইবে না। অবশেষে যাওয়াই স্থির করিয়া এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় সে তাহাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, বাহির হইতে শিকলটা বন্ধ রহিয়াছে। রোদের দিকে পিঠ করিয়া উঠানে একবার বসিল; ভাবিল, আমোদী হয়ত কোথাও বেড়াইতে গেছে, আর লোথাই টব্‌গাড়ী ঠেলিতেছে। বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। মনে পড়িল, ম্যানেজারের বাড়ী চাকরীর কথা। . . .

বাবুদের বাসার ভাঙা প্রাচীরের পাশে উঁকি মারিয়া নরুকে ডাকিতে গিয়া সুমুখেই দেখিল, আমোদী হেঁট্‌মুখে বসিয়া বসিয়া এঁটো বাসন মাজিতেছে! তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া লোটনী বাড়ী ফিরিতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, আমোদী যে তাহাকে কয়লা ছুঁড়িয়া মারিয়াছে এবং রাত্রে খাইতে দেয় নাই সে-কথা তাহার বাবাকে জানাইয়া আসে।

লখাই খাদের মুখ হইতে ডিপো পর্য্যন্ত ট্রাম-লাইনের উপর কয়লা-বোঝাই টবগাড়ী ঠেলিত। এখন সে যে টব-গাড়ী ঠেলে না এবং এই টালোয়ানী কাজে চিরদিনের মত ইস্তফা দিয়া কোথায় চলিয়া গেছে, সে-খবর সে জানিত না। একটা নিম গাছের নীচে দাঁড়াইয়া লোটনী দেখিল, চার পাঁচ বার ঘুরিয়া টবগাড়ী গুলা পার হইয়া গেল, তবু লখাইএর দেখা আর মিলিল না। সে অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদেরই প্রতিবেশী এক সাঁওতালকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা কোথা, কালিন্দী ?

—বাহারে ! তুই ছিলি কোথা ! পরশু তোর বাবা মরেছে, সে খবর জানিস্ না ?

লোটনী বিস্ময়াহত হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, কি বল্লি ? কে মরেছে ?

—তুর বাবা, লখাই।

লোটনী যে গাছের নীচে দাঁড়াইয়াছিল, সেই গাছটার গায়ে হেলান্ দিয়া দাঁড়াইল।

তাহারা গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে চলিয়া গেল।

—লোটনী একটু পরে ধীরে-ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। কোথায় যাইতেছে নিজেই জানে না। তবু চলিল। তিন নম্বর

খাদের আগুনের পাশ দিয়া চলিতে চলিতে বড় রাস্তায় গিয়া উঠিল।

বরাবর আপন মনে চলিতে চলিতে বেলা পড়িয়া আসিল। ক্রমে প্রান্তরের উপর অন্ধকার নামিল। তবু তাহার চলার শেষ নাই। শেষে যখন অন্ধকারে আর পথ চিনিতে পারা গেল না তখন সে দেখিল, জামুড়িয়া হাটের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হাটের ফেরত কুলি-কামিনগুলা তখন পথের উপর দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। হাটের কয়েকটা দোকানে মিট্ মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে। পথের পাশেই কয়েকটা ইঁট-পাঁজা তখনও কুয়াসার মত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা যায় না। পশ্চাতে মাত্র সমস্ত কোলাহল ভেদ করিয়া জামুড়িয়া কুঠির ইঞ্জিনটার সাঁই সাঁই ঘড়্ ঘড়্ শব্দ কাণে আসিয়া বাজে।

লোটনীর হঠাৎ মনে পড়িল, ভক্ত-সাহেবের মেলা দেখিতে গিয়া কাল একটা বাউরী-ছোক্‌রা তাহাকে চার আনা পয়সা দিয়াছে,—সিকিটা এখনও আঁচলে বাঁধা। কিন্তু এতক্ষণ সে কথা তাহার মনেই ছিল না। ভাবিল, হাটে কিছু কিনিয়া খাইবে। দোকান খুঁজিতে গিয়া সুমুখে দেখিল, এক মদের দোকান। এখানে-সেখানে কয়েকজন মাতাল টলিয়া টলিয়া

ঘুরিতেছে, কত কি বলিতেছে! দোকানের ভিতর একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছিল,—সুমুখে একটা ছোট্ট জানালার ভিতর দিয়া দোকানী মদ বেচিতেছে।—লোটনী ধীরে-ধীরে সিকিটা সেই দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—মদ চার আনার।

চার আনার মদ কতটুকুই-বা! লোটনী ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিশ্বাসে সবটা খাইয়া ফেলিল। গত রাত্রি হইতে পেটে কিছু পড়ে নাই। নেশা ধরিতে দেরি হইল না। হু হু করিয়া শীতের বাতাস বহিতেছিল। লোটনী টলিতে টলিতে একটা গাছের নীচে আসিয়া হোঁচট্ খাইয়া পড়িল। তখন আর তাহার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না।

এদিকে ঠিক সেই সময়ে জোড়জানকী কুঠিতে ম্যানেজার-বাবু নরুকে ধমক্ দিতেছিলেন,—হারামজাদা বেটা পাজী, আমাদের জাত-জম্ম আর রাখ্‌লি না দেখ্‌ছি। এই আমোদী হারামজাদীর স্বামী লখা বাউরী মারা গেছে, এখনও তিন দিন পেরোয় নি, তার এখনো পুরো অশৌচ, আর তুই কিনা তাকেই আন্‌লি এঁটো বাসন মাজতে, হারামজাদা!...কাল থেকে খবর্‌দার বল্‌ছি ওকে বাসন ছুঁতে দিসনে।

নরু হাতজোড় করিয়া বলিল, আমি জান্‌তুম না হুজুর!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কেলেঙ্কারী

শীতকালের রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। উন্মুক্ত পল্লী-প্রান্তরের উপর অন্ধকার ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। শুষ্কপ্রায় সিঙ্গারণ নদীর মৃদু কলধ্বনি, আর পরিপক্ক শস্য ক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে একটা কয়লা-কুঠির ইঞ্জিনের সাঁই-সাঁই শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

নীল-বনের ঘন-বিন্যস্ত গাছপালার মধ্য দিয়া, রাঙা মাটির পাকা রাস্তা ধরিয়া ল্যাথ্‌রা মাঝি হন্ হন্ করিয়া চলিতেছিল। তাহার হাতে একটা বাঁশের লাঠি, মাথায় বাব্‌রি চুলের উপর একটা গাম্‌ছা জড়ানো। হু হু করিয়া শীতের বাতাস বহিতেছে। গাছের পাতায় পাতায় ঝির্ ঝির্ করিয়া শব্দ হইতেছিল।

ল্যাথ্‌রা জাতিতে সাঁওতাল, তার উপর মদ খাইয়াছে, সমস্ত শরীর তাহার গরম। তাই শীতের বাতাসটা তাহার খালি গায়ে লাগিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতেছিল বলিয়া

মনে হয় না। পিঠের শিরদাঁড়াটা এক-একবার চম্ চম্ করিয়া তাহাকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল মাত্র। কিন্তু এ-সবের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে তখন তাহার হাতের লাঠিটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া আরও জোরে জোরে রাস্তা হাঁটিতে লাগিল।

গ্রামে পৌঁছিয়া ল্যাথ্‌রা একেবারে জমিদার-বাড়ীর সদর ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক নিঝ্‌ঝুম্! হাঁকিল, বাবু, অ বড়বাবু, ঘরে আছিস্?

কয়েকটা ডাকের পর দারোয়ান বাহির হইয়া আসিল। বলিল,—কোন্ হ্যায়্?

—আমি রে আমি! কুঠির ল্যাথ্‌রা মাঝি।

—এত রাত্রে যে?

ল্যাথ্‌রা দারোয়ানের কাছে সে-সবের জবাবদিহি করিতে আসে নাই। বলিল—তোর অত-সব শুনে কাজ নাই, লে। বাবুকে একবার ডাক্! বল্, জোড়-জানকী থেকে ল্যাথ্‌রা সর্দ্দার এসেছে।

এতরাত্রে সর্দ্দার কুঠি হইতে কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছে জানিবার জন্য শরৎ বাবুকে উঠিতে হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, খাদের ভিতর হয়তো কোনও কুলি-মজুর খুন হইয়াছে,

তাই তাড়াতাড়ি গায়ে গরম কাপড় জড়াইয়া বাবু নামিয়া আসিলেন।

ল্যাথ্‌রা হাতের লাঠিটা মাটিতে নামাইয়া ফটকের একপাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, বাবুর পায়ের শব্দ পাইয়া সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিয়াই বলিয়া উঠিল,—চল্‌ বাবু, তোকে একবার এখনি কুঠি যেতে হবেক্‌।

—কেন বল্‌ দেখি ল্যাথ্‌রা? খুন-টুন কিছু—

—না বাবু, খুন্‌-জখম্‌ কিছু লয়। যেতে হবেক্‌—চল্‌।

খুন্‌-জখম্‌ কিছু হয় নাই শুনিয়া বাবু হাফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু এ না-ছোড়্‌-বান্দা সাঁওতাল যখন ধরিয়া বসিয়াছে, তখন সে তাহাকে লইয়া যাইবেই। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, তবে কি-জন্যে যেতে হবে বল্‌ দেখি?—ক্কা'ল গেলে হবে না?

ল্যাথ্‌রা মিনতির স্বরে বলিল, না বাবু, তোর পায়ে ধর্‌ছি, চল্‌। কেনে যেতে হবেক্‌ বল্‌লে হয়ত' যাবি নাই। তুই হাওয়াগাড়ীতে উঠ্‌, তবে বল্‌ব।

এই সাঁওতাল পোষ্যগুলিকে রাখিবার জন্য সময়-অসময় এরূপ বহু অত্যাচার কয়লাকুঠির মালিকদের সহ্য করিতে

হয়, তাই অনন্যোপায় হইয়া বাবু সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। দরোয়ান লণ্ঠন হাতে নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিলেন,—ড্রাইভারকে মোটর বের করতে বল, আমি আসি।......তুই ততক্ষণ এইখানে বসে' থাক ল্যাথ্রা।

ল্যাথ্রা একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাবুর মুখের পানে একবার সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাইল এবং পরক্ষণেই ফটকের পাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, হঁ বাবু, তুই আয়—আমি বসে' রইলম্।

বাবু মোটরে উঠিয়া ল্যাথ্রাকে ড্রাইভারের পাশে বসিতে হুকুম করিলেন। সে অতি সঙ্কুচিত ভাবে ধীরে-ধীরে আসনের নীচে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। মোটরে চড়িবার সৌভাগ্য জীবনে তাহার কোনদিনই হয় নাই, আজ সেই আশাতীত সৌভাগ্যলাভ করিয়াও সে বেশী-কিছু বলিতে পারিল না; মনে-মনেই বলিল,—তোর ঢের্ পর্‌মাই হোক্ বাবু, তোর দৌলতে জম্মের সাধ হাওয়াগাড়ীতে চাপ্‌লম্।

মোটর চলিয়াছে। সেই জমাট অন্ধকারের ভিতর দুইটা গোলাকার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মনে হইতেছে যেন একটা ক্রুদ্ধ দানব ছুটিয়া চলিতেছে।

এতক্ষণে প্রবল বাতাসের বেগে ল্যাথ্‌রার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। মাথার গামছাখানা খুলিয়া সে তাহার গায়ে জড়াইয়া লইল।

কুঠির প্রায় কাছাকাছি আসিয়া বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার বল্ দেখি ল্যাথ্‌রা, কি হয়েছে?

ল্যাথ্‌রা বলিল—ঠিকাদার জোয়ান্ সিংকে কুঠি থেকে' তেড়ে' দিবি চল্, তা যদি না দিস্ ত' আমরা কেউ তোর কুঠিতে কাজ করব নাই। নিজের চোখে সব দ্যাখ্‌গা তুই। আমি বল্‌তে লার্‌ছি বাবু, আমাকে আর শুধোস না।

আম-বাগানের পাশে সাঁওতাল কুলিদের এক-নম্বর ধাওড়ার কাছে গাড়ীখানা আসিয়া পৌঁছিতেই ল্যাথ্‌রা ড্রাইভারকে বলিল, আমাদের ধাওড়ার কাছে দাঁড়াবি বাবু।

মোটরখানা ঘচ্ ঘচ্ করিয়া দাঁড়াইবার তালে তালে সে বলিয়া উঠিল,—এ্যা, এ্যা,—হু, এ—এ—এইখানে।

ল্যাথ্‌রা গাড়ী হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বাবুকে বলিল,—আয় দেখ্‌সে, আয় বাবু, আমার সর্ব্বনাশ দেখ্‌বি আয়।—

রাগে ও দুঃখে তখন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিয়াছে।

বাবু দেখিলেন, তাহাদের খড়ো ঘরগুলার পাশে যে

অপরিসর উঠানটুকু আছে, তাহারই একধারে কতকগুলা কয়লা জ্বালাইয়া, আগুনের চারিপাশে কয়েকজন মাল্-কাটা সাঁওতাল কুলি চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে এবং অদূরে পাশাপাশি দুইটা আম গাছের গুঁড়িতে দুইটা লোককে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বন্ধনাবস্থায় যাহারা নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল, বাবু তাহাদের দেখিবামাত্র চিনিলেন। একজন তাঁহারই খাদের ঠিকাদার জোয়ান সিং এবং অপর একজন ল্যাথ্‌রা সর্দ্দারের যুবতী কন্যা—রেবী।

ব্যাপারটা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

বাবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। একজন মাতব্বর গোছের সাঁওতাল বলিয়া উঠিল, পঁচিশ নম্বর কাঁথি থেকে উয়াদিকে ধরে' এনেছি বাবু। কি দণ্ড কর্‌ছিস্ কর্ উয়াদের। না হয়, বলিস্ ত' ওই র‍্যাল্ গাড়ীতে আমরা জোয়ান্ সিংকে চাপাঁই দিয়ে আসি,—উ ঘর যাক্।

বাবু বলিলেন,—না রে মাঝি, আমি ওর দশটাকা জরিমানা কর্‌লুম। হলো ত?......দে ওদের খুলে দে।

দশটা টাকা তাহাদের বিবেচনায় কম নয়!—আচ্ছা জরিমানা না হয় ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু—

তৎক্ষণাৎ আর-একজন সাঁওতাল বলিয়া উঠিল,—আর রেবী ? আমরা ত' উয়াকে আর ঘর ঢুক্‌তে দিব নাই। জোয়ান্ সিং বলুক্—উয়াকে বিয়ে করে' ঘরে রাখ্‌বেক্।

বাবু জোয়ান্ সিংএর দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বোল্‌ছ জোয়ান্ ?

সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল এবং ইহাও বলিল যে, সে আজই রেবীকে নিজের ঘরে লইয়া যাইতে রাজি আছে।

জোয়ান্ সিংকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্যই ল্যাথ্‌রা মাঝি এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। রেবীকে যে তাহার হাতে চিরতরে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে, এবং সে-কাজটা যে তাহার পক্ষে কত কঠোর, সে কথা তো সে একটিবারের জন্য ভুলিয়াও ভাবে নাই! না—না, তার চেয়ে সে নিজেও বরং সমাজ পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে তবু তার একমাত্র কন্যাকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দিতে পারিবে না!

রেবী অধোমুখে লজ্জায় জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রেবী! জোয়ান্ সিংএর ঘরে যাবি ?

রেবী নিরুত্তর।

পুনরায় প্রশ্ন হইল, বল্ না কি বল্‌ছিস্ ?

দণ্ডাজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া অসামী যেমন ভাবে বিচারকের

মুখের পানে তাকায়, ল্যাথ্‌রা মাঝি তেমনি উদ্‌গ্রীব হইয়া কন্যার মুখের পানে তাকাইল।

রেবী অস্ফুট কণ্ঠে কহিল,—হাঁ, যাব।

উত্তরটা স্বকর্ণে শুনিয়াও ল্যাথ্‌রার মনে হইল, ভুল শুনিয়াছে। আগ্রহাতিশয্যে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল,—এ্যা, এঁ্যা, কি বল্লেক্ বাবু?...উ কি বল্লেক্?

বাবু বলিলেন, রেবীও যেতে চায়।

প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিশ্চলভাবে ল্যাথ্‌রা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল।..........এতক্ষণ পরে হিমে তাহার সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, হাঁটু দুইটা অসম্ভব রকম কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

তাহাদের মধ্যে একজনকে ইঙ্গিত করিয়া বাবু কহিলেন, ওদের বাঁধন খুলে দে মাঝি! যা, তোরা চলে' যা।

ল্যাথ্‌রা অতি কষ্টে মৃদু অথচ কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—বাবু, তুই এবারে ঘর যা।

জোয়ান্ সিং রেবীকে লইয়া চলিয়া গেলে, অন্যান্য যাহারা উপস্থিত ছিল, সকলেই আপন আপন ধাওড়ায় ফিরিয়া গেল। ল্যাথ্‌রা কিন্তু সে স্থান হইতে নড়িল না।

অনেকেই বলিল,—চল্ মাঝি ঘরে চল্, ভেবে কি হবে?

সে মৃদুস্বরে কহিল, যাই। কিন্তু উঠিতে পারিল না। মনে হইল, তাহার সমস্ত শরীর-মন অবসন্ন অসাড় হইয়া গেছে। এ কি হইল তার? মুহূর্ত্তের মধ্যে যে এমন করিয়া সব ওলট্‌পালট্ হইয়া যাইবে তাহা সে জানিত না!............রেবী! মা আমার! এত নিষ্ঠুরতা তুই কখন শিখিয়াছিস্?

সে আজ অনেকদিনের কথা। রেবীর মা তাহাকে ল্যাথ্‌রার কাছে সেই কত ছোটটি রাখিয়া মরিয়া গিয়াছে ল্যাথ্‌রা তাহাকে কোলে-পিঠে করিয়া এত বড়টি করিয়া তুলিয়াছে, আর আজ কি না সেই রেবীই এম্‌নি করিয়া চলিয়া গেল!

ল্যাথরার মনে পড়িতেছিল,—সে কোন্ সুদূর জঙ্গলের ধারে, লাউ আর কুম্‌ড়ো-লতায়-ঘেরা তাহাদের বহুকালের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরখানি। রাঙা-ফুলে-ভরা শিমূলগাছের তলায় রেবীকে মাটিতে শোয়াইয়া দিয়া, রেবীর মা বনে বনে ঝরা পাতা কুড়াইয়া বেড়াইত। আর ল্যাথ্‌রা তীর-ধনুক লইয়া মনের আনন্দে মহুয়া বনের ধারে ধারে পাখী শিকার করিত। যদি কোনদিন পাখীর পিছু ছুটিতে ছুটিতে ল্যাথ্‌রা নদীর কিনারে কিনারে বহুদূরে

গিয়া পড়িত, তাহা হইলে রেবীর মা'র চিন্তার আর অন্ত থাকিত না। সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকিত,—মাঝি, ফিরে' আয়! সে আহ্বান কোনোদিন-বা গহন বনের পাতার ভিড় ঠেলিয়া তাহার কাছে পৌঁছিতে পারিত না, আবার কোন-কোন্‌দিন নদীতট প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রিয়তমের ডাক কাণে আসিয়া বাজিলেই সে শিকার ফেলিয়া ছুটিয়া আসিত। দেখিত, মাথা ভরা কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে রাঙা-রাঙা শিমূল ফুল গুঁজিয়া রেবীকে কোলে তুলিয়া সে গাছের নীচে দাঁড়াইয়া হো হো করিয়া হাসিতেছে,—কেমন মাঝি! ফিরে এলি তো!

ল্যাথ্‌রা, স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া বাড়ী ফিরিত।

সে আনন্দের খেলা বেশীদিন চলিল না। একদা এক অন্ধকার রজনীর শেষ প্রহরে, তাহার বড় আদরের কন্যা রেবীকে তাহারই কোলে ফেলিয়া দিয়া, তাহার মা মরণ-ঘুম ঘুমাইল। রেবীর মুখে তখন আধ-আধ কথা। সবেমাত্র চলিতে সুরু করিয়াছে।

প্রিয়াহীন শূন্য কুটীরে ল্যাথ্‌রার মন টিঁকিল না। রেবীকে লইয়া সে কয়লা-কুঠিতে কাজ করিতে আসিল। আজ উনিশটি

বছর তাহাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিবার পর আজ এ কি হইল!

যে-জাতিটার মনের কথা আজ পর্য্যন্ত কেহই টের পায় নাই, ল্যাথরা তাহাই বুঝিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মনের দুঃখে সেখান হইতে উঠিয়া তাহার অন্ধকার ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে আজ আলোটি পর্য্যন্ত জ্বলে নাই! কে-ই বা জ্বালিবে? পিতার স্নেহার্ত্ত মন আবার রেবীর জন্য হাহাকার করিয়া উঠিল। বুকের উপর এ কি নিদারুণ অপমানের গুরুভার চাপাইয়া গেলি মা! কাল সে লোকের কাছে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া?

ছেঁড়া কাঁথাখানা সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া ল্যাথ্রা অন্ধকার ঘরের মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। ঘুম হইল না। দূরে গাছপালা-গুলা ঘন কুয়াসার মত ধোঁয়ায় ভরিয়া গেছে। প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই। এতক্ষণে তাহার মনে হইল, কাল সমস্তদিন খাদের নীচে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর রাত্রে কিছুই সে খাইতে পায় নাই। ক্ষুধায় তখন তাহার পেটের নাড়ী-কয়টা পাক্ দিয়া উঠিতেছিল। এ পেটের জ্বালা হয়ত দুমুঠা শুক্‌নো চা'ল চিবাইলেই নিভিতে পারে, কিন্তু তাহার মনের এ দুঃসহ বেদনার

নিবৃত্তি হইবে কেমন করিয়া! রেবীই যে আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেছে!

ঘুট্‌ঘুটে' আঁধার রাত কবে বল্‌তে পারিস্‌ বাবু?

...মাসখানেক পরের কথা। অণ্ডাল ষ্টেশনে ভাড়ার টাকা জমা দিতে গিয়া ফিরিতে একটু রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া শ্যামবাবু বাগান-ধাওড়ার পাশ দিয়া অন্ধকারেই যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে কুঠি ফিরিতেছিল। কথাটা কাণে যাইতেই থমকিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে প্রশ্নকর্ত্তাকে ভাল চিনিতে পারা গেল না; বলিল, কে রে? কি বল্‌ছিস্‌?

আমি গঃ! তুদেরই ল্যাথ্‌রা মাঝি! এই শুধোছিলম্‌ যে আমাবস্যার রাত কবে?

—ও, ল্যাথ্‌রা! শ্যামবাবু একটু ভাবিয়া বলিল, আজ ত্রয়োদশী, তাহ'লে পরশু অমাবস্যা।...কেন রে? অমাবস্যার রাত নিয়ে কি হবে তোর?...রেবী কোথা রে? ঠিকাদারের বাসায়?

কথাটা কুঠির সকলেই জানিত।

—হঁ বাবু, যা তুই। বলিয়া ল্যাথ্‌রা ধীরে-ধীরে অন্ধকারে পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে ল্যাথ্‌রা কাজে গেল না। বহুদিন পূর্ব্বের প্রায় অব্যবহার্য্য অবস্থাতেই তাহার ঘরে একটা তীর-ধনুক পড়িয়া ছিল। সেইটা নূতন করিয়া কাজে লাগাইবার জন্য সমস্তটা দিন বাঁশের ছিলা কাটিয়া এবং নীল-বনের জঙ্গলে নানারকম গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়াই কাটাইয়া দিল।

কি-সব গাছের পাতার রস মাখাইয়া লৌহ নির্ম্মিত তীরের ফলা বিষাক্ত করিবার প্রণালী ল্যাথ্‌রা শিখিয়াছিল। সে কোন্ মধুর যৌবনের গতদিনে বনে-জঙ্গলে এই সব বিষের ফলা দিয়া সে বাঘ পর্য্যন্ত শিকার করিয়াছে। সেদিনও তাই হঠাৎ কি-একটা কথা মনে হইতেই সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কয়েকটা বিষ-বাণ ও একটা ধনুক সে নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিল।

পরদিন বৈকালে একটা কুকুরের গায়ে বিষ-বাণ পরীক্ষা করিতে গিয়া ল্যাথ্‌রা দেখিল, কুকুরটা কিছুক্ষণ আর্ত্তনাদ করিয়া পেটে তীর লইয়াই মরিয়া গেল।

কুকুরের পেট হইতে তীরটা বাহির করিয়া ল্যাথ্‌রা ভাবিল ঠিকই হইয়াছে। এম্‌নি এক অন্ধকার রাত্রে একটা মানুষের বুকের উপর এই তীর বিঁধিতে হইবে! তীর-ধনুকটা সযত্নে ঘরের একপাশে নামাইয়া রাখিতেই দুঃখে অনুশোচনায় ল্যাথ্‌রার মুখে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল।... ...সাঁওতাল

সে! অপমান সহিবার ক্ষমতা তাহার নাই! জোয়ান্ সিংএর্ জান্ লইবে!

দুই হাতের শিথিল-মুষ্ঠি একবার প্রাণপণ চেষ্টায় শক্ত করিয়া লইয়া নিজের বুকের উপরেই ঠাই ঠাই করিয়া দুইটা ঘুসি বসাইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যেই ল্যাথ্‌রা উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল,—রেবী!

বৃদ্ধের দুই চোখ বাহিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিল।

* * * *

সেদিন গভীর দ্বিপ্রহর রজনীতে কোলের মানুষ চেনা যায় না—এত অন্ধকার।

ল্যাথ্‌রা মাঝি সন্ধ্যা হইতে মদ খাইতেছিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার জম্‌কালো-রকমের নেশা জমিতেছিল না। অবশেষে মাটির পানপাত্রটা সে দূরে ছুঁড়িয়া দিয়া তীর-ধনুক লইয়া জোয়ান্ সিংএর ঘরের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। আজ তাহার বহুদিনের শিক্ষা সফল হইবে। যে-শত্রু তাহার বুকে অতৃপ্তির বহ্নি জ্বালাইয়াছে, এই বিষবাণে তাহাকে বিনাশ করিয়াই আজ তাহার তৃপ্তি!

রেবী যতদিন জোয়ান্ সিংএর বাড়ীতে গিয়াছে, ততদিন ল্যাথ্‌রা ভুলিয়াও একবার সে-পথ দিয়া হাঁটে নাই, তাই আজ

এই একটি মাসের মধ্যেই তার বহুকালের চেনা পথটা একটু অপরিচিত বলিয়াই মনে হইতেছিল।

ট্রাম লাইনের একটু দূরেই অড়হর ক্ষেতের পাশে জোয়ান্ সিংএর খড়ো-ঘর দেখা যাইতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে পথ চলিতে চলিতে কখনও-বা কাঁটাগাছের বনে ল্যাথ্‌রার পা ছড়িয়া যায়, কখনও-বা শুক্‌নো অড়হরের ডালে হোঁচোট্‌ খাইয়া পুনরায় নিজেকে সাম্‌লাইয়া লয়। এমনি করিয়া অতি সন্তর্পণে সে জোয়ান্ সিংএর ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, ঘরের মধ্যে একটা হ্যারিকেন্ লণ্ঠন জ্বলিতেছে এবং সে আলোকের ছটা জানালার বাহিরেও খানিকটা আসিয়া পড়িয়াছে। পাশের অন্ধকারে একটু সরিয়া গিয়া ভাবিল, ঠিক, জানালার ফাঁকে তীর ছুঁড়িলেই চলিবে। বাঁ-হাতের মুঠার মধ্যে ধনুকের বোঁটাটা বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া লইল। চারিদিকের প্রান্তরের উপর ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ রব এবং অদূরে চৌধুরিদের কুঠির জল মারা পাম্পের ঘচ্ ঘচ্ শব্দ শোনা যাইতেছিল। এ শব্দটাও তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মনে হইতেছিল, দৌড়িয়া গিয়া 'পম্পে'র ইঞ্জিনটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসে।

চোরের মত ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়া জানালার কাছে তীর লক্ষ্য করিয়া, ঘরের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইতেই

দেখিল, অদূরে একটা খাটের উপর জোয়ান সিং ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার বুকের মাঝে তীর লক্ষ্য করিয়া টানিয়া সেটা সে ছাড়িতে যাইবে এমন সময় দেখিল, একি! তাহার বুকের পাশে আর-একখানা এ কার মুখ! আজ উনিশটি বছর ধরিয়া যে-মুখখানি সে দিবারাত্রি চোখে-চোখে রাখিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে নাই,—যাহার একদণ্ডের অদর্শনে সে অধীর হইয়া ছুটিয়া বেড়াইত, এ যে তাহার সেই বড় আদরের রেবীর ঘুমন্ত মুখখানি! ...মাগো! তোকে যে আজ একটি মাস দেখি নাই!

ল্যাথ্রার বুকের উপর অলক্ষিতে কে যেন সজোরে এক পদাঘাত করিল। তাহার হস্ত শিথিল হইয়া আসিল। হাতের বিষাক্ত তীরখানা দূরে অড়হর ক্ষেতের মাঝে ছুঁড়িয়া দিয়া, তাহার একমাত্র কন্যার মুখখানা সে একবার দেখিয়া লইল! কলঙ্কের চিহ্ন তো সেখানে কোথাও নাই। দেখিল, নিশ্চিত আরামে সে নিদ্রা যাইতেছে।

ল্যাথ্রা জোর করিয়া নিজের চোখ দুইটা সেদিক হইতে ফিরাইয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

ঘটনার দিন-চার পরে, একদিন সন্ধ্যায় রেবী নিজের মনকে আর কোন প্রকারেই বুঝাইতে পারিতেছিল না। পিতাকে

জাতিচ্যুত হইবার কলঙ্ক হইতে বাঁচাইয়া সে যতটুকু শান্তি পাইবার আশা করিয়াছিল তাহা তো সে পায় নাই! জোয়ান সিংএর বাড়ীতে আসিয়া সে ভাবিয়াছিল, পিতার সহিত বাস করিবার আনন্দটুকু হইতে বঞ্চিত হইলেও তাহার সহিত দেখা করিবার সুযোগ তাহার প্রত্যহই মিলিবে। কিন্তু জোয়ান্ সিং তাহাকে দিবারাত্রি এম্‌নি কড়া পাহারায় ঘিরিয়া রাখিয়াছিল যে, সে একদণ্ডের জন্য বাড়ীর বাহির হইতে পাইত না।

জোয়ান্ সিংএর নিষেধ-আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়াই রেবী সেদিন সন্ধ্যায় ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। বাগান-ধাওড়ায় পৌঁছিয়া তাহাদের বহুকালের পরিচিত কুঁড়ে ঘরখানির দুয়ারে আসিয়া ডাকিল,—বাবা!

ভিতর হইতে কোন সাড়া শব্দ আসিল না।

আর-একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া আবার ডাকিল,—বাবা!

কোথাও কোন শব্দ নাই।

দরজার কাছে আসিয়া দেখিল, বাহির হইতে শিকল বন্ধ। রেবীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই একটা সেঁদো মাটির ভ্যাপ্‌সা গন্ধ তাহার নাকে আসিয়া লাগিল।

সেই অন্ধকার শূন্য কুটীরের নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়াইয়া রেবীর বুকের স্পন্দন যেন ক্রমশ ভয় ও ভাবনায় দ্রুত হইয়া আসিতেছিল। গণ্ড বাহিয়া তাহার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

উত্তর পাইবে না জানিয়াও রেবী ভাঙা-ভাঙা স্বরে আর একবার ডাকিল,—বাবা!

কাহারও কোনও জবাব পাওয়া গেলনা। বড়্‌ধনা ক্ষেতের ভিতর হইতে একটা টিক্‌টিকি টিক্‌টিক্ করিয়া সাড়া দিয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'সারি-পাঁচি'

পৌষ-সংক্রান্তির হিম-আড়ষ্ট অপরাহ্ণ-বেলায় পেতাপ্ বাউরীর উঠানে 'সারি-পাঁচির' মজ্‌লিস্ বসিয়াছিল। আজ দু'তিন দিন তাহারা কয়লা-খাদে কাজ করিতে যায় নাই,—যত সব নষ্ট-চরিত্রা মেয়েদের কাছে টাকা আদায় করিয়া মদ খাইতেছে এবং নাচ গান করিয়া আমোদ-আহ্লাদে দিনগুলা যে কেমন করিয়া তাহারা পার করিতেছে কাহারও খেয়াল নাই!

পেতাপের উঠানের একপাশে একটা ছেঁড়া চাটাইএর উপর তাহারা বসিয়াছিল। দু'তিনটা মদের হাঁড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিল। মুড়ি কড়াইভাজা এবং বেগুনির চাট্ সমস্ত উঠান জুড়িয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মধ্যাহ্ন-বেলায় যখন উঠান-ময় রৌদ্র ছিল, তখন হইতে একটু একটু করিয়া মদ চলিতেছে, এখন পড়ন্ত বেলায় শীতের প্রকোপও একটু বেশী হইয়া আসিল, গাছের পাতাগুলা নাড়িয়া বাতাস বহিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে কাঁপন্ ধরাইতেছিল; পেতাপ্ তাহার পরনের কাপড়খানা বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়া বলিল,—গরবী, তোর বাপ্ কই?

এক যুবতী বাউরীর মেয়ে, উঠানের একপাশে একটা পত্রবিহীন কুলগাছের নীচে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়াছিল, পেতাপের ডাক্ শুনিয়া, অদূরে লছু বাউরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,— এই যে!

লছু একটুখানি আগাইয়া আসিয়া বলিল,—এই যে আমি রইছি হে সদ্দার!

পেতাপ্ সর্দ্দারের জবাফুলের মত রাঙা চক্ষু দুইটি তখন অর্দ্ধমুক্ত। ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিল,—হঁ·····বল্‌ছিলম্ কি, তুদের গরবী তো শ্বশুরঘর যায় না।...হঁ। একটু চুপ্ করিয়া ঘাড়টা ইতস্তত সঞ্চালন করিতে করিতে পুনরায় বলিল,—বল বেটে কি না লয়?...হেঁ-হেঁ।

লছু ধীরে-ধীরে বলিল,—মান্‌লম্—তা বেটে।

স্বীকারোক্তি পাইয়া অপেক্ষাকৃত জোর গলায় পেতাপ্ বলিল,—তবে,—হুঁ...হুঁ। বুঝলি,—দশটাকা!—গরবী, শুন্! কাল সকালেই দশ টাকা...বাস্, সম্বচ্ছর আর কেউ 'রা'টি কাড়্‌বেক্ নাই।

লছু একবার চোখ দুইটা তুলিল বটে কিন্তু গরবীর মুখের পানে তাকাইতে পারিল না, অনুযোগের স্বরে বলিল,—বড় বেশী হলো সর্দ্দার, উ ছেলেমানুষ, কোথায় পাবেক্ বল্?

পেতাপ্ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই হাত বাড়াইল, মদ্যপাত্র রূপে ব্যবহৃত কাঁশার একটা বড় বাটি হাতে ঠেকিতেই সেইটা তুলিয়া লইয়া জোরে-জোরে মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে কহিল,—বেটে—বেটে ? লিজেব্ বেলায় তা হবেক্ নৈ কি !......বাহারে লছু! মাখনীর না-হয় বয়েস্ উয়ার চেঁয়ে দু-বছর কম, 'কম্পাস'-বাবুর ঘরেই না হয় কাজ করে, সে যখন পঁচিশ্ টাকা দিলেক্, তখন গরবীকে দিতে হয় তিরিশ্ টাকা ! না না উ-সব শুনা হবেক্ নাই লছু, দশ টাকার কম কাল 'ঘেগেনের' দিনে কিছুই হবেক নাই।...হঁ, ঠিক্, ঠিক্, লে বাবু লে, আর কথা ক'স্ না। চট্ করে' আর-এক বাটি মদ ঢাল্—গরম ধরুক্। বাবাঃ যে জাড়্! বলিয়া পেতাপ্ মদের জন্য হাতের বাটিটা অগ্রসর করিয়া দিয়া বেশ জম্কাইয়া বসিল।

আর-এক 'কচ্' করিয়া মদ চলিবার পর পেতাপ্ এক গ্রাস শুক্নো মুড়ি ও একটা কাঁচা লঙ্কা চিবাইতে চিবাইতে গরবীর দিকে একবার তাকাইল। গরবী তখন কুলগাছের তলায় বসিয়া বসিয়া পাত্রের অবশিষ্ট মদটুকু পান করিতেছিল। পেতাপ্ বলিল,—যা তবে তুঁই গরবী, তাগাদা দে তোর বাবুকে, যা।

গরবী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।

সাঁওতালদের কুলি-ধাওড়ায় তখন 'বোঙাবুড়ির' পূজা এবং মুর্গি বলিদান চলিতেছিল।

গরবী সেই রাস্তা দিয়া পার হইয়া কয়লা-কুঠির বহুকালের জরাজীর্ণ আফিস-ঘরটার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, একটা হাতভাঙা চেয়ারের উপর বসিয়া বড়বাবু নন্দলাল কপালের উপর চশমাটা তুলিয়া রাখিয়া একখানা বড় খাতার উপর কি যেন লিখিতেছে। টেবিলের একধারে একটা ধুম্র-মলিন হ্যারিকেন লণ্ঠন মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। অফিস-ঘরের আসবাব-পত্রের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে একটা জাপানী 'ক্লক' বহুকাল ধরিয়া, ছয়টার ঘরে বারোটা, এবং বারোটার ঘরে ছ'টা বাজিয়া আসিতেছে। ঘরের এক কোনে একটা ঘুন্-ধরা কাঠের 'বুক্-সেল্ফের' উপর ধূলি-মলিন খাতাপত্র বোঝাই করা আছে। সেখানে ইস্তক্ কুঠির আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত খাতাই খুঁজিলে পাওয়া যায়। তাহারই একপাশে একটা আলমারি—বড়-ছোট, ভাঙা-গোটা, নানারকমের শিশিতে বোতলে পরিপূর্ণ। ডাক্তারবাবু ছাড়া আর কাহারও সে আল্মারিতে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হইলেও, তাহার প্রত্যেকটি কাঁচ ভাঙিয়া যাওয়ায় সম্প্রতি তাহার ভিতরের ঔষধগুলি কুলি-মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া ইতরবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই করুণায়

আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পেরেকের উপর লোহার শিকে-ঝোলানো চিঠির বোঝায় চারিটি দেওয়ালের কোথাও এতটুকু অংশ খালি পড়িয়া নাই।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার ঠিক এই সময়টায় বড়-বাবু নন্দলাল তাহার উপরি-পাওনার হিসাব ইত্যাদি খাতায় তুলিয়া লয়। ইহার পূর্ব্বে কুঠিতে যে বাঙ্গালী ম্যানেজার ছিলেন, তাঁহার আমলে নন্দলালকে এত-সব কিছুই করিতে হইত না। ম্যানেজার বাবু তাহাকে একটু নেক-নজরে দেখিতেন এবং সময় অসময় তাঁহার ফরমাস্-মত 'বস্তু' জোগাইতে পারিলে নানাপ্রকারে সহজ রোজগারের পন্থা বাত্‌লাইয়াও দিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কমিশনের লোভে রেজিং বাড়াইতে গিয়া নাকি অন্যায় উপায়ে তিনি একমাসের মধ্যে পাঁচটি মাল-কাটা কুলি খুন্ করিয়া ফেলিলেন এবং সেই অপরাধে 'মাইন্‌স্-ইন্স্‌পেক্টর্'-সাহেবের আদেশে তাঁহাকে কয়লা-কুঠির ম্যানেজারির কাজে চিরদিনের মত ইস্তফা দিতে হইল। এখন তাঁহার জায়গায় আসিয়াছেন একজন ইংরাজ ম্যানেজার। সাহেবকে নিজের হাতের মুঠার মধ্যে আনিবার জন্য নন্দলাল চেষ্টার ত্রুটি করে নাই,—বহু তোষামোদ করিয়াছে, অনেক প্রকার প্রলোভন দেখাইয়াছে কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত অর্ব্বাচীন শ্বেতাঙ্গটিকে কিছুতেই সে

বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে, কয়লা-কুঠির ম্যানেজারি চাকরীটা কত সুখের ; কাজেই তাহার কষ্টের আর অন্ত ছিল না। উপরি-পাওনার হারটাও কমিয়া আসিয়াছিল। এই সব নানা কারণে আজ কাল তাহার মেজাজটাও প্রায় সকল সময়েই বেশ রুক্ষ হইয়া থাকে।

হঠাৎ হাতের চুড়ির ঝুন্ ঝুন্ শব্দ পাইয়া নন্দলাল খাতা হইতে মুখ তুলিয়া দরজার দিকে তাকাইতেই দেখিল, গরবী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে আজ অফিস-ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া নন্দলাল একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দরজার কাছে আসিতেই গরবী বলিল,—আমাদের 'সারি-পাঁচি' মজলিসে সদ্দার আমার নামে দশ টাকা চাঁদা ধরেছে,—দিতে হবেক্।

নন্দলাল ভাবিল, দু'একদিন পরে দিলেও চলিবে, বলিল,—কবে ?

—আজই। না দিলে চল্‌বেক্ নাই। দাও। বলিয়া গরবী হাত পাতিয়া বসিল।

—বাঃ, গাছের ফল পেয়েছিস্ নাকি ? নাড়া দিলেই পড়্‌বে ভাবিস্—যা...এখন যা তুই গরবী, পরে হবে।

উত্তরে গরবী একটু রাগের ভাণ করিয়া চৌকাঠ

ধরিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল,—বাহা-রে! সম্বচ্ছরে দশটা টাকা, তাও যদি দিতে লারবি, তবে তুর অত সখে কাজ কি উনোন্-মুখো!

গরবীর কাছ হইতে তাহার এই আদরের গালাগালি শুধু আজ বলিয়া নয়, সেটা ছিল তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক। কাজেই নন্দলাল তাহাতে রুষ্ট না হইয়া, চকিত-নয়নে একবার দরজার এদিক-ওদিক দেখিয়া লইয়া খপ্ করিয়া হাতটা তাহার ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—যাও গরব্ যাও, আজ না হয় কাল সকালে এসো, আমি টাকা দেবো।

গরবী এইবার একটু জোর গলায় বলিল,—অতসব মিষ্টি কথায় আমি ভুল্‌ছি না বাবু, আজ লিব তবে উঠ্‌ব।

—বটে! তবে তোর যা খুশী তাই কর্‌গে যা,—আমি দিতে পার্‌ব না।

গরবীর সত্য-সত্যই রাগ হইল। যে-লোকটা তাঁহাকে পথভ্রষ্টা করিয়াছে, এবং গত তিন বৎসর ধরিয়া বহু লোকের বহু প্রলোভন সে যাহার জন্য এড়াইয়া আসিয়াছে, যাহার জন্য সমাজে তাহার ও বৃদ্ধ পিতার লাঞ্ছনার আর অন্ত নাই, আজ তাহারই কাছে সম্বৎসরের পাওনা মাত্র দশটি টাকা চাহিতে আসিয়া তাহাকে যে এমন করিয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইতে

হইবে তাহা সে জানিত না। গরবী উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—না দিস্ খাল্ ভরা, এই আমি চল্লুম সায়েবের কাছে বল্‌তে,—দেখি কেমন করে' না দিয়ে পারিস্।

এইবার নন্দলালের ভয় হইল। তাহাদের ম্যানেজার-সাহেব লোকটি যে তেমন সুবিধার নয়, তাহা সে বেশ ভাল করিয়াই জানিত। গরবী যদি আজ রাগের মাথায় তাহাকে সমস্ত কথাই বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে সাহেব না-জানি কি করিয়া বসিবে। নন্দলাল তাড়াতাড়ি গরবীর পিছু-পিছু ছুটিয়া গিয়া ডাকিল—গরবী, শোন্!

গরবী একবার ফিরিয়াও চাহিল না দেখিয়া নন্দলাল আর-একটু তাড়াতাড়ি চলিয়া পিছন হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল,—থাম্, গরব, আজ বাজে-রোজগার মোটে সাড়ে চোদ্দ গণ্ডা পয়সা। মাইরি বল্‌ছি, না হয় তুই দেখ্ পকেটে হাত দিয়ে।...যাক্, যা হবার তা'ত হয়েছেই, তুই এই পথের বাঁকে কদম্ গাছের তলায় দাঁড়া, আমি চট্ করে' বাড়ী থেকে' দেখে আসি কিছু পাই কি না!

গরবী এইবার একটু নরম হইয়া গেল; পথের পাশে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সত্যই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

গরবীর বিবাহের সময় শ্বশুরবাড়ী হইতে সে একটা রূপার

সাতনরা হার পাইয়াছিল। সে তাহাকে অতি যত্নে একটা কাপড় জড়াইয়া হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া দিত এবং পূজা, পার্ব্বন মেলা ইত্যাদি হইলে বাহির করিয়া পরিত। আজ তাহার সেই মূল্যবান গহনাখানি বাহির করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে খাজাঞ্চিবাবুর নিকট হইতে ঝুম্‌ঝুমির বালাখানি ছাড়াইয়া লইয়া আসিল।

ভাবিল, ঝুম্‌ঝুমির হাতে ফিরাইয়া দিবে, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তো দেওয়া চলিবে না!

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই, বালাখানি অঞ্চলে বাঁধিয়া পেটের নীচে লুকাইয়া গরবী নন্দলালের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নন্দলাল বাড়ীতে ছিল না, নণ্টু ও ঝুম্‌ঝুমি সুমুখের অপরিসর প্রাঙ্গণের উপর ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, রন্ধনশালায় বসিয়া সাবিত্রী একমনে তরকারী কুটিতেছিল।

গরবীকে দেখিয়া সাবিত্রী বলিয়া উঠিল,—এ বেলায় এলে যে বাউরী-বৌ?

সাবিত্রী তাহাকে বাউরী-বউ বলিয়াই ডাকিত।

গরবী প্রথমে বুঝিতেই পারিল না—কি উত্তর দিবে। একটু ভাবিয়া বলিল,—কাজ ছিল নাই তাই দেখ্‌তে

এলম্—তোমার উনোন্ ধরানো হলো কি না—ধরাই দিব না কি ?

—না, উনোন্ আমার ধরে গেছে—আর ধরাতে হবে না।

গরবী ধীরে-ধীরে বালাখানি বাহির করিয়া নণ্ট ও ঝুম্‌ঝুমির সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘরের উপর গিয়া উঠিল। ভাবিল, বিছানার তলায় রাখিয়া দিবে।

তাহার অনভ্যস্ত হাতখানা বাড়াইয়া বিছানার নীচে রাখিতে যাইবে, এমন সময় সেদিকে সাবিত্রীর হঠাৎ নজর পড়িয়া গেল সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ওকি বাউরী-বৌ, বিছানাটা ছুঁয়ে ফেল্‌লে যে ! ও কি রাখ্‌লে কি ওখানে ?

গরবীর মুখখানা নিমেষেই ধরা-পড়া চোরের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। মুখে কিছুই বলিতে পারিল না, এক পা নড়িতেও পারিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বিছানাটা উল্টাইয়া দেখিল,—ঝুম্‌ঝুমির বালা। নির্ব্বাক বিস্ময়াহত হইয়া সেও কিয়ৎক্ষণ তাহার রক্তহীন মুখের পানে তাকাইয়া, কহিল,—তুই তো আজ কদিন আসিস্ নি ?—কখন নিয়েছিলি ?

হেঁটমুখে ধীরে ধীরে গরবী উত্তর দিল—হাঁ, নিয়েছিলাম।

সাবিত্রী আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, —তুই এমন তা আমি জান্‌তুম্ না—ছি, ছি,—দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা হয়েছিল এতদিন।...যা...বেরো আমার সুমুখ থেকে। তোকে কাজ কর্‌তে হবে না আর।

গরবী কলঙ্কের বোঝা লইয়া তেমনি হেঁট্‌মুখে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মায়ের কথা শুনিয়া নন্টু ও ঝুম্‌ঝুমি খেলা বন্ধ করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। নন্টু গরবীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল,—তবে রে চোর!

গরবী ট্রাম লাইনের পাশ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল; দেখিল, একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া মদের নেশায় টলিতে টলিতে নন্দলাল সেই দিকেই আসিতেছে।

তাহার সহিত কথা কহিতেও গরবীর ঘৃণা বোধ হইতেছিল। ভাবিয়াছিল, পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু নন্দলাল তাহাকে চিনিতে পারিয়া খপ্ করিয়া গরবীর অঞ্চলের একটা প্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়া জড়িতস্বরে কহিল,—কি গো গরব-সুন্দরী, সন্ধ্যাবেলা কোথা থেকে?—

একটা হেঁচ্‌কা টান্ মারিয়া তাহার হাত হইতে কাপড়টা জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া গরবী শুধু বলিল,—যাঃ!... বে-ইমান্ কোথাকার!

গরবীর রাগের কারণটা যে কি, নন্দলাল তাহা বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

গরবী আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

নন্দলাল বাসায় ফিরিয়া সাবিত্রীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল; বলিল,—এ্যা এমনতর ব্যাপার! কাল থেকে' ও চোর হারামজাদীকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিও না আর!

* * * * * *

দিন-কয়েক পরে, নন্দলাল নিজে হইতে একদিন গরবীর অনুসন্ধান করিতে গিয়া শুনিল, সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইস্তফা

পুরাতন ম্যানেজারের জবাব হইয়া গেলে, বামনদাস বাবুর ডোম্‌রনা কয়লা-কুঠিতে একজন ছোক্‌রা-বয়সের নূতন সাহেব ম্যানেজার বহাল হইয়া আসিলেন।

প্রথমে কুঠিতে আসিয়াই সাহেব বড়বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নূতন ম্যানেজার আসিবে জানিয়া, বড়বাবু তখন নিবিষ্ট মনে পেছ্‌লি কাজ সারিয়া লইতেছিল। বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিতেই, তাড়াতাড়ি কলমটা কাণে গুঁজিয়া, চটি চট্‌পটাইয়া সাহেবের নিকট আসিয়া সে এক লম্বা সালাম ঠুকিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইংরাজীতে সে ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না, মাইনর স্কুলের ফাষ্টক্লাস পর্য্যন্ত বিদ্যায় সেটা একপ্রকার অসম্ভবও ছিল, কাজেই তাহার চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

বড়বাবুর চেহারাখানি বেশ নাদুশ-নুদুশ,—অর্দ্ধ বৃদ্ধ, বাঙালী ভদ্রলোক। মাথার চুল ছোট করিয়া কাটা, গোঁফ-জোড়াটি কুণ্ডলিকৃত হইয়া মুখের ভিতর আসিয়া ঢুকিয়াছে, উপরের

পাটির দাঁত একটিও নাই। চশমাখানা কপালের উপর তখনও তোলা রহিয়াছে, তাড়াতাড়িতে সেটা নামাইয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

সাহেব বেশ ভাল বাঙ্‌লা জানিতেন; তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন,—বসো বাবু, বসো।

বড়বাবু বসিলে, সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমিই বড়বাবু? আচ্ছা, কুঠির অবস্থা কি, আমায় সব কথা বল দেখি।

বড়বাবুর এক যুবক পুত্র আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া গ্রামের যত-সব বদ্‌মায়েস্‌ ছেলেদের সঙ্গে 'বোম্বেটেগিরি করিয়া, মদ গাঁজা খাইয়া, যাত্রার দলে বক্তৃতা করিয়া এবং এমনি আরও-সব কত কি করিয়া, পিতার বদন দগ্ধ করিতেছিল; তাই বড়-বাবু বহুদিন হইতে মনে করিয়াছিল, কোনপ্রকারে কুঠির কোন একটা বাবুকে তাড়াইয়া তাহার স্থানে পুত্ররত্নকে বহাল করিয়া দিতে পারিলেও বা কোন রকমে ছেলেটা মানুষ হইয়া যায়, কিন্তু পুরাতন ম্যানেজারের আমলে সে সুবিধাটুকু ঘটিয়া উঠে নাই এবং সেইজন্য আজ কার্য্যারম্ভের প্রথমেই ম্যানেজার সাহেবের নিকট গৌর-চন্দ্রিকা করিয়া রাখিল,—কুঠির অন্যান্য অবস্থা বিশেষ মন্দ নয় সাহেব, কিন্তু গুদামের অবস্থা তেমন

সুবিধা নয়। গুদামবাবু কারও কথা শোনে না,—'ষ্টোরের' জিনিস বেপরোয়া চুরি করে। গুদোমটা প্রায় সাবাড় হতে চলেছে। সুতরাং পুরাতন 'ষ্টকের' সঙ্গে present stockটা একবার 'চেক্' করে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

—তা বেশ, তারপর—অফিস ?

—হুজুর, অফিসের খাতা-পত্র সব দুরস্ত আছে।

—'রেজিং' কত ?

—মাসে চার-হাজার, সাড়ে চার হাজার।

সাহেব অফিসের খাতাপত্র একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া 'খাদে' নামিবার পূর্ব্বে বড়বাবুর কথামত গুদামবাবু নরেশকে একবার ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নরেশ নেহাৎ নিরীহ গো-বেচারা। কম্পিতপদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, ওহে শুন্‌ছো নরেশ, সাহেব কি বল্‌ছেন একবার ভাল করে শোন।

সাহেব নরেশের মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন—তোমার 'ষ্টোরে' সব জিনিস আছে ত' ?

নরেশ ভয়ে-ভয়ে হাত জোড় করিয়া বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে।

সাহেব বলিলেন, অল্‌রাইট্ তোমাকে একটা present

stock list করে' দিতে হবে।—ছু' একদিনের মধ্যেই।……… বড়বাবুর কাছে দিও। যাও!

নরেশ চলিয়া যাইতেছিল, বড়বাবু হাতের ইসারা করিয়া বলিল, শুন্‌লে হে নরেশ? শুন্‌লে—কোথায় submit কর্‌তে হবে শুন্‌লে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলিয়া নরেশ চলিয়া গেল।

নরেশকে সাহায্য করিবার জন্য গুদামে অন্য-কোন কর্ম্মচারী ছিল না, কাজেই কুলি-কামিনদের কেরোসিন তেল মাপিয়া দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় কাজ তাহাকে একা করিতে হইত। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়াও সে দিনের কাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার উপর একটি-একটি করিয়া গুদামের প্রত্যেকটি জিনিসের তালিকা করিবার ভার তাহারই উপর পড়ায়, সে বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বড়বাবু প্রত্যেক দিন তাহাকে তাড়াহুড়া দিতে আরম্ভ করিল। সাহেব কিছুই বলিত না, অথচ বড়বাবুর কাছে তাড়া খাইয়া সে একদিন বলিয়া বসিল,—আমি এই কাজটাই একজন 'এসিষ্টেণ্ট্' ছাড়া পেরে' উঠ্‌ছি না, তার ওপর Stock-list

তৈরী কখন করি বলুন তো? আমাকে দয়া করে একটি হপ্তার সময় দিন, আমি Stock-list দিয়ে কাজ ছেড়ে দেব।

বড়বাবু বলিল—তার মানে?

—আজ্ঞে আমি জবাব দিতে চাই—আর পারছি না।

—তবে তাই দাও না হে!...এসো তুমি সাহেবের কাছে, আমার কাছে বল্‌লে কি হবে বাপু!—বলিয়া বড়বাবু তাহাকে একপ্রকার টানিতে টানিতে সাহেবের নিকট লইয়া হাজির করিল।

সাহেব মুখ তুলিয়া বলিলেন—কি?

নরেশ বলিল,—আমায় এক হপ্তার সময়......

বড়বাবু বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আসল কথাটাই বল না হে কি বলছিলে। অমন ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড় কেন?

নরেশ শঙ্কিত হইয়া বলিল, বলছিলুম, আমার একজন 'এসিষ্টেণ্ট' না হ'লে—

বড়বাবু মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিয়া উঠিল, এঃ, ওঁর আবার এসিষ্টেণ্ট না আরো-কিছু! লাট-সাহেব এলেন আর কি! সাহেবের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—এই যে আমাদের সাহেব, ওঁকে একা এই কলিয়ারীর সব কাজ দেখতে হয় জানো

তো? তোমার চেয়ে ওঁর বয়েস তো কম বই বেশী নয়।······ আমাদের বাঙ্গালী জাতটাই এম্‌নি আলসে-কুঁড়ে, খেতে পেলে শুতে চায়।···বুঝলে সাহেব?

সাহেব কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এদিকে বাহিরে তখন কতকগুলা কুলি তেল লইবার জন্য গুদামের উঠানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, বাইরে ও কিসের হল্লা?

বড়বাবু বলিল, ও দেখ্‌ছেন কি, কুলিরা চেঁচাচ্ছে তেল নেবার জন্যে।

সাহেব নরেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—এখন যাও, কাজ করগে, এর পর ভেবে দেখা যাবে।

নরেশ চলিয়া গেলে, বড়বাবু সাহেবকে বলিল, ও হচ্ছে পাকা শয়তান! Stock চেক্ করতে গেলেই ধরা পড়্‌বে কি না, তাই ইচ্ছে করেই দেরী করছে সাহেব! ওকে জবাব দেওয়াই উচিত।

সাহেব বলিলেন—এ তোমাদের ভুল সন্দেহ। ও যদি চুরি না ক'রে থাকে? আর জবাব দিলেই বা তুমি এখনই গুদোমে লোক কোথায় পাবে বড়বাবু?

বড়বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, লোকের ভাবনা সাহেব?

আজই বলুন, কত গণ্ডা পাকা ষ্টোর-কিপার চাই। আমি গেরেণ্টি দিচ্ছি, সাহেব। আমার একজন চেনা লোক আছে —এইখানে কোথা এক কোম্পানীর ঘরে কাজ করে, Expert man—বলেন তো সন্ধান করে তাকেই আনিয়ে দিই।

সাহেব বলিলেন, তা বেশ। তোমার কয়লার stock-বুক্ খানা up-to-date করে রেখেছ তো বাবু?

বড়বাবু সাহেবের একটু কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, সব complete,—বাকী শুধু March. ডিপো-সরকারের কাছ থেকে একবার Balance পেয়েছি কি মেরে দিয়েছি! তবে কাল পাবে না সাহেব, এ কথা ঠিক। আজ office hour এর পর আমাকে একবার বাড়ী যেতে হবে, সত্য-নারাণের পূজো আছে। দেখ না সাহেব আমাদের বাপ চোদ্দ-পুরুষের কাজ দেখ না। বার মাসে তের দুগুণে সাঁইত্রিশটা! সেরিমণি বাড়ী আমাদের খুবই কাছে সাহেব। within two miles.

সাহেব চুপ করিয়া খাতায় কি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। বড়বাবু প্রসন্নচিত্তে বাহির হইয়া আসিল।

গুদামবাবুকে তাড়াইবার জন্য বড় বাবুকে আর বেশী কিছু

কষ্ট পাইতে হইল না। শনিবার দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে গুদামের সমস্ত কাজ সারিয়া রবিবার সে বাড়ী গিয়াছিল; সোমবার সকালে বড়বাবু কাজে আসিয়া দেখিল, গুদাম তখনও বন্ধ, গুদামবাবু কাজে আসে নাই। গুদামের উঠানে দাঁড়াইয়া কুলি-কামিনেরা গাঁইতি সাবল লইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে।

বড়বাবু সুযোগ বুঝিয়া সাহেবের কাছে নালিশ করিল, দেখছ সাহেব-বেলা ন'টা বাজতে যাচ্ছে এখনও তোমার গুদাম-বাবুর দেখা নাই। এরকম unpunctual লোক নিয়ে কাঁহাতক্ কাজ চলে বল ত? আর সেই stock-list সে আজ হপ্তা-খানেক্…কেও? ডাক্তারবাবু? আসুন।

ডাক্তারবাবুকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বড়বাবু চুপ করিল।

ডাক্তারবাবু আসিয়া জানাইলেন গত রবিবার প্রাতে গুদামবাবুর কলেরা হইয়াছিল, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সে মারা গিয়াছে।

বড়বাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—অ্যাঁ মারা গেছে? বল কি ডাক্তার?

নরেশের এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে তহার বুকের ভিতরটা

কেমন যেন করিতে লাগিল। সাহেব হতবুদ্ধির মত নির্ব্বাক-ভাবে ডাক্তারের মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

চাপরাশীর কাছে চাবি লইয়া সাহেব নিজে গুদাম-ঘর খুলিয়া দিয়া বড়বাবুকে বলিলেন,—আজকার মত তোমাকেই কাজটা চালিয়ে দিতে হবে বড়বাবু। কি কর্‌বে বল আর তো spare লোক দেখ্‌ছি না।

বড়বাবু মহাবিপদে পড়িল। গুদামে কাজ করিবার ইচ্ছা তাহর ছিল না। শুনিতেছে সে নাকি কলেরায় মারা গেছে। কাজ কি বাপু! একই জায়গায় বসিয়া কাজ করিতে গিয়া তাহারও যদি অমনি একটা কিছু—

বড়বাবু আর ভাবিতে পারিল না। মনিবকে ফাঁকি দিয়া সে আজ পঁচিশ বৎসর কাজ করিতেছিল এবং তাহার এই বহুদিন-ব্যাপী গোলামীর কল্যাণে সে আর-কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুক আর না-ই করুক, উপস্থিত-বুদ্ধিটুকু তাহার যথেষ্ট জন্মিয়াছিল। চট্‌ করিয়া বলিয়া ফেলিল, সাহেব, এখনো আমার ঢের কাজ বাকী। তার চেয়ে এক কাজ কর। Wagon supply বন্ধ বলে' আমার ডেস্‌পেচ-ক্লার্ক হরেন-ছোকরা আজ ক'দিন ধরে বসে আছে। তাকেই দিই এখানে, আজকার মত চালিয়ে দিক্‌, তারপর অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।

অফিসের কোন বাবুর সহিত বড়বাবুর মনের মিল ছিল না, তবে এই হরেন ছোকরার সহিত যেন একটু বেশী রকমের অসদ্ভাব,—উভয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি প্রায় প্রত্যহই হইত। এবং হরেনকে তাড়াইবার চেষ্টাও সে সাধ্য পক্ষে কম করে নাই, তবে আজ পর্য্যন্ত তাহার চাকরিটি নষ্ট করিবার সুযোগ মিলে নাই বলিয়াই সে কোনরকমে টিকিয়া আছে। ইহাদের উভয়ের মনোমালিন্যের একটু কারণও ছিল। অফিসের কাগজ কলম পেন্সিল ডাক-টিকিট ইত্যাদি থাকিত হরেনের গচ্ছিত। বড়বাবুর দুইটি ছোট ছেলে স্কুলে পড়িত, তাই সময় সময় পেন্সিল কাগজ ইত্যাদি ফাঁক পাইলেই নির্ব্বিচারে সে বাড়ী লইয়া যাইত। প্রথমে হরেন খাতির করিয়া বড় একটা কিছু বলিত না, পরে যখন মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া উঠিল তখন সে আর না বলিয়া থাকিতে পারিল না।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া, বড়বাবু তাহার গায়ের কাপড়ের নীচে দিস্তা পাঁচ ছয় কাগজ লুকাইয়া লইয়া বাড়ী যাইতেছিল। পথে দেখা হইল, হরেনের সঙ্গে। একটা সঙ্কীর্ণ রাস্তার মধ্য দিয়া উভয়ে চলিতেছিল, কাজেই হরেনের গায়ের ধাক্কা লাগিয়া কাগজগুলা অসামাল হইয়া গিয়া হঠাৎ কাপড়ের নীচে হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। হরেন

বুঝিতে পারিয়া বলিল, এগুলো কি বড়বাবু,—এ যে অফিসের কাগজ।

বড়বাবু পুনরায় সেগুলা তুলিয়া লইয়া বলিল,—হ্যাঁ, খাবে তুমি, তোমার বাবার।

হরেন আর নিজেকে ঠিক রাখিতে পারিল না, মুহূর্ত্তেই রাগিয়া উঠিয়া বলিল —খবরদার বলছি বড়বাবু, মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌বেন। আমি জানি, আপনি রোজ-রোজ এম্‌নি করে' আফিসের জিনিস চুরি করে' নিয়ে যান। আমি আজ সাহেবকে না বলি, ত'—

ঝগড়া করিবে কি, বড়বাবু তখন চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

—বলে' তুমি আমার যা করে' নিতে পার, কোরো।—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল।

কথাটা হরেন অফিসময় রাষ্ট্র করিয়া দিতে ছাড়িল না। সেইদিন হইতে হরেনের সহিত বড়বাবুর ঝগড়া। আজ সুযোগ বুঝিয়া সেইজন্যই সে গুদোমের কাজ করিতে নরেশের জায়গায় তাহাকেই পাঠাইবার জন্য সাহেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল। সে ভাবিল, যদি মরে তো সেই মরুক্!

সাহেবের আদেশ-মত হরেন গুদামে কাজ করিতে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় সাহেব বলিলেন, বড়বাবু, সেই যে তুমি কে একজন Expert গুদামবাবুর কথা বলেছিলে, তাহাকে এনে দিতে পার না ?

বড়বাবুর এই Expert গুদামবাবুটি আর কেহই নয় তাহার বোয়াটে পুত্র-রত্ন। কিন্তু এই অশুভ স্থানে ছেলেকে সে পাঠায় কেমন করিয়া ? বলিল—আমি তার সন্ধান নিয়েছিলুম সাহেব, তার অসুখ হয়েছে, দিনকতক পরে আসবে।

হরেন বেশ চালাক ছোকরা। গুদামবাবুর কাজ সে বেশ ভালই চালাইতেছে দেখিয়া একদিন সাহেব বলিলেন, তোমার Despatch Clerk তো গুদামের কাজ বেশ চালাচ্ছে, এইবার একটা Despatch Clerk দেখ।

বড়বাবু মহা আনন্দিত হইয়া বলিল,—কালই নিয়ে আসছি সাহেব, লোকের ভাবনা কি ?

পরদিন বড়বাবু তাহার পুত্র রাখহরিকে লইয়া আসিয়া সাহেবকে বলিল, সাহেব! এই নাও তোমার লোক—যার কথা বলেছিলুম, ডেসপেচের কাজ ও বেশ ভালো জানে।

রাখহরি ডেসপেচের কাজে ভর্ত্তি হইল।

কয়েকদিন পরে, কি-একটা কাজের জন্য রাখহরি সাহেবের

কাছে গিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি Despatch Babu ?

—আমার নাম রাখহরি ব্যানার্জ্জি।

—আমার বড়বাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় হ'ল কেমন করে ?

—আজ্ঞে, আমি তাঁরই ছেলে।

সাহেব সে-কথা জানিতেন না এবং বড়বাবুও সে-সম্বাদ তাঁহার নিকট গোপন করিয়া, কোন-এক পরিচিত ভদ্রলোক বলিয়াই তাহার পরিচয় দিয়াছিল। এতক্ষণে সাহেব ভিতরের ব্যাপার সবই বুঝিতে পারিলেন।

সে দিন কথায়-কথায় সাহেব বলিয়া ফেলিলেন, রাখহরি তোমার ছেলে,—কই, সে-কথা তো আমায় কোনদিন বল নাই ?

বড়বাবু পুত্রকে মনে-মনে গালাগালি দিয়া বেশ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া ফেলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তার Step father.

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, সে আবার কি ? হিঁদুর মেয়েদের তো দু'বার বিয়ে হয় না !

এতক্ষণে বড়বাবুর স্মরণ হইল যে, সে ইংরাজী কথাটা ভুল

বলিয়া ফেলিয়াছে। বলিল,—না, না, সাহেব I mistake. সে আমার Second wife এর Son.

সাহেব না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। মুখে হাসিলেন বটে, কিন্তু বড়বাবুর এই মিথ্যা চাতুরীর জন্য মনে-মনে বেশ একটু অসন্তুষ্ট হইলেন।

যাহাহউক, ডেস্‌পেচের কাজের চেয়ে গুদামের কাজ অধিক লাভবান হইলেও বড়বাবু রাখহরিকে ডেস্‌পেচের কাজেই রাখিল, কারণ সে মনে মনে আঁচিয়া রাখিয়াছিল, যে গুদামবাবুর কাজে যে ব্যক্তিকে সে পাঠাইয়াছে, সে নিশ্চয়ই মারা যাইবে।

দিন-পনর পরে, একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা শুনিতে পাওয়া গেল। বড়বাবু সে দিন কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় উন্মত্তের মত অাফিসে প্রবেশ করিয়া সাহেবকে জানাইল, যে, তাহার পুত্র রাখহরির সর্পদংশনে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে।

পুত্র শোকাতুর বড়বাবুর কাছে এই ঘটনাটা যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে, হরেনকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়া পুত্রকে সে বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে এবং প্রতিনিয়তই সে তাহার শত্রুরূপী হরেনের মৃত্যুসংবাদ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব

হইয়াও থাকিত—এমন সময় যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাও ঘটিতে পারে, এ বিশ্বাস তাহার মোটেই ছিল না।

পুত্রের মৃত্যুর জন্য দিনকতক অফিস কামাই করিয়া বড়বাবু পুনরায় কাজে আসিয়া দেখিল, হরেন গুদামের চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টমনে কাজ করিতেছে। তাহার মুখের পানে বড়বাবু তাকাইতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, হরেনই তাহার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে।

বড়বাবু একদিন সাহেবের কাছে একখানা দরখাস্ত পেশ্ করিল। সাহেব দেখিলেন, বড়বাবু চাকরীতে ইস্তফা দিতে চায়। অনেক ভাবিয়া সাহেব দরখাস্তটা না-মঞ্জুর করিয়া ফেরত পাঠাইলেন।

বড়বাবু বসিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছিল। ভগবানের এ কি অন্যায় অবিচার!……পুত্রের চেয়ারখানা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে।

সাহেব হরেনকে বলিলেন, তুমি গুদোমের কাজ ছাড়িয়া Despatchএর কাজে যাও। আমি গুদামবাবুর জন্য advertise করে দিচ্ছি।

বড়বাবু ও ডেস্‌পেচবাবু একটা ঘরের দুইটা কামরায় পৃথক পৃথক্ কাজ করিত। সাহেব হুকুম দিলেন, পাশাপাশি

দুইখানা টেবিল দিয়া এখন হইতে তাহারা মুখোমুখি বসিয়া কাজ করিবে।

বড়বাবু প্রমাদ গণিল। এ যে আরও বেশী ভয়াবহ; পুত্রের মুখের পরিবর্ত্তে অনুক্ষণ তাহাকে শত্রুর মুখখানাই—না, না, সে পারিবে না!

পুরাতন কাগজপত্র উল্টাইতে গিয়া রাখহরির হাতের লেখা ও সহিগুলা দেখিয়া বড়বাবুর চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল—বেদনার্ত্ত বুকখানা হাহাকার করিতে লাগিল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সাহেবের কাছে গিয়া বলিল,—না সাহেব, আমি আর কাজ করিতে পারিবনা। আমায় জবাব দাও।

সাহেব বলিলেন, পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমার। তোমায় ওই কাজেই থাকতে হবে বাবু।

বড়বাবু ভাবিল, সাহেব তাহার একান্ত হিতৈষী। তাহা হইলে কি হয়, এযে তাহার মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক।

সাহেব মনে মনে বলিল, এতদিনেও তোমাদের যদি না চিনিতে পারিয়া থাকি তবে আমার এতকাল ভারতবর্ষে থাকাই বৃথা হইয়াছে। ইহাই তোমার উপযুক্ত শাস্তি শয়তান!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অশ্রু-জল

—'আঃ, মাথা নেই, মুণ্ডু নেই,—কি বল্‌ছ ছাই! তার চেয়ে চুপ্‌ করে' শোও।

—এই শুয়েছি।—কিন্তু ঘুম যে আসে না গো, তার চেয়ে একটা গল্প বল না—আমি শুনি।

—গল্প জানি না।

—ইস্‌! জান না?......না,—ব-লো!

স্বামী চুপ করিয়া রহিল। স্ত্রী কিছুতেই ছাড়িবে না। বলিল, সেই যে কি লিখছিলে, দাঁড়াও, খাতাটা নিয়ে আসি। তুমি পড়। আমি শুনি।

বলিয়া সে খাতাখানা আনিয়া তাহার হাতে দিল।

স্বামী পড়িতে সুরু করিল। স্ত্রী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

জয়ন্ত ছিল আমার বন্ধু। দেখ্‌তেও যেমন সুপুরুষ, লেখা-পড়াও জান্‌তো তেমনি। কিন্তু বড় গরীব।

হ্যাঁ, লেখাপড়া জান্‌লে আবার গরীব হয়?

—বক্‌ছো কেন? শুনেই যাও না।—হ্যাঁ, গরীবই ছিল। নিজের বল্‌তে কেউ ছিল না তার—বাপও না, মা'ও না। অতিকষ্টে এক বড়লোকের বাড়ী মানুষ হয়েছিল। তারপর, সে যখন এম্‌-এ পাশ কর্‌লো, তখন সেই বড়লোক, জোর করে' একরকম আর-এক বড়লোকের বাড়ী তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। পরের ছেলের বোঝাটা হয়ত তিনি আর বইতে পারছিলেন না, তাই আর একজনের ঘাড়ে সেটা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। নিজেই রোজগার করতে পারে না, তার উপর বিয়ে করে' আর একজনের দায়িত্ব গ্রহণ করবার ইচ্ছা জয়ন্তর ছিল না। ভেবেছিল, যতদিন পর্য্যন্ত না তার নিজের একট-কিছু সংস্থান করে' নিতে পার্‌ছে ততদিন বিয়ে কর্‌বে না, কিন্তু কি আর করে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়েটা হয়ে গেল।

স্ত্রীর নাম নন্দরাণী! মস্ত এক বড়লোকের একটিমাত্র আদরিণী মেয়ে! জয়ন্ত নিতান্ত ছন্নছাড়া পথের কাঙাল হ'লে কি হয়,—সাধ ছিল, বৌটি হবে সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা —ঠিক তার মনের মতন। কেউ যখন নেই তার, তখন তাকেই সে তার মাথার মণি করে' রাখ্‌বে,—আরও কত কি সে করবে। সে-সব ছিল তার স্বপ্ন!——কিন্তু হায়, শুভদৃষ্টির সময় তার ব্যগ্র ব্যাকুল চোখদুটি তুলেই দেখলে

—যাকে সে প্রাণ-মন দিয়ে চেয়েছিল, এ সে নয়! এর মুখের পানে তাকাতেও ভয় করে।

কল্পনার বিচিত্র জগৎ তার আকাশকুসুমে পরিণত হয়ে গেল!

জয়ন্তর নূতন জীবন শুরু হলো,—দুর্গম কাঁটাভরা পথে নিরুদ্যম এক যাত্রীর মতন।

জয়ন্ত দেখ্‌লে—নন্দরাণী নিতান্ত অশিক্ষিতা এক পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে।—কতকগুলা কুসংস্কার নিয়ে বেড়ে উঠেছে মাত্র। সৎশিক্ষা সে কোনদিনই পায় নি। জয়ন্ত বই নিয়ে বসতো, আর নন্দরাণী তার খেলার সাথীদের নিয়ে, নিতান্ত ছেলে মানুষের মত এঘর-ওঘর করে' ছুটে' বেড়াতো। তাদের উভয়ের মধ্যে এই নিদারুণ অসামঞ্জস্য জয়ন্তকে বড় বেশী পীড়িত করে তুল্‌তো, তবু সে কোনদিন স্ত্রীর কাছে জান্‌তে দিত না, যে, সে তাকে ভালোবাসে না। কিন্তু এমন ভালোবাসার অভিনয় ক'রে আর কতদিন কাটে! এ যে মিথ্যা দিয়ে প্রাণের সত্যকে গোপন রাখা!······গভীর নিশীথে হয়ত কোন কোন দিন জয়ন্তর ব্যাকুল বক্ষ আলোড়িত করে' চুম্বন তৃষাতুর ওষ্ঠ দুটি কেঁপে কেঁপে' উঠ্‌ত,—স্ত্রীর নিদ্রিত মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে, দুহাতে বুক চেপে' নিজের মুখখানা শেষে

সরিয়ে নিয়ে আস্‌তো।—শিয়রে প্রদীপের ক্ষীণ শিখা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তো। দাঁতে দাঁত দিয়ে প্রাণপণে নিজের ঠোঁটদুটি চেপে ভাব্‌তো—হায়, হায়! একি প্রবঞ্চনা! এযে অবলার সাথে মিথ্যা চাতুরী! অভাগী তাই জয়ন্তর কাছ থেকে পেতো, মাত্র একটু করুণা,—অসহায়ার প্রতি একটুখানি সহানুভূতি!

জয়ন্তর ক্রমাগত মনে হতো, এর থেকে কি অব্যাহতি নেই? কে যেন তার কানে-কানে বল্‌তো,—না,—নেই,—নেই!—ধরো, তুমি যদি কুরূপ, কুৎসিত, মূর্খ হতে, আর সে হতো নন্দনের পারিজাত! ...তাই কি? তবে কি তাই? হা ভগবান্! জয়ন্ত ভেবে কিছু কূল-কিনারা পেতো না।

এমন দিনে তার এক সহপাঠি বন্ধুর বিবাহ-সভায় যোগদান করবার জন্যে কল্‌কাতা থেকে একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র আস্‌তেই, জয়ন্ত আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে কল্‌কাতা রওনা হলো,—তার পরদিনই!

আলোকোজ্জ্বল বিবাহ-সভায় নববধূকে নিয়ে আসা হলো,—জয়ন্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলে—তার সহপাঠী বন্ধু যোগেশের স্ত্রী বিভার লজ্জাবনত সুন্দর মুখখানির পানে! বাসন্তী রঙের খদ্দর বিভূষিতা নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কন্যার সারা অঙ্গে সে কি অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী! বেশীক্ষণ তার দিকে

তাকিয়ে থাকৃতে পারলে না সে, বিভার চম্পক অঙ্গুলিগুলি যখন যোগেশের হস্তবন্ধনীর মধ্যে বাঁধা পড়্লো, জয়ন্তের সারা অঙ্গে তখন কাঁটা দিয়ে উঠেছে,—নীচের দিকে মুখ রেখে' সে ভাবছিল, অদৃষ্টের একি নিষ্ঠুর পরিহাস! তার নন্দরাণী কি এমনটি হতে পারতো না! এমন কি অপরাধ করেছে সে,—যার জন্যে সে এমন করে' বঞ্চিত?

পরদিন যোগেশ ইত্যাদি পরিচিত বন্ধুরা যখন জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করে বস্লো,—লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়েটা সেরে ফেল্লে, অথচ বৌ দেখালে না—কখন দেখাবে বল?······তখন যদি জয়ন্তর মাথায় বজ্রাঘাত হতো, তাহ'লেও সে তত বেশী দুঃখিত হতো না। নীরবেই কিয়ৎক্ষণ কাটিয়ে সে উত্তর দিল,—হ্যাঁ, দেখাব একদিন ভাই······

কল্কাতায় থাকৃবার মত কোন সংস্থান তার ছিল না, তবু জয়ন্ত আর শ্বশুরের বাড়ীতে ফিরে' না গিয়ে এক বন্ধুর 'মেসে' দিনকতক থেকে তাকে জানালে, একটা চাক্রী-বাক্রী জুটিয়ে দাও ভাই, আমি এইখানেই থাকৃবো।

মার্চ্চেণ্ট-অফিসে একটা কাজ জুটলো। জয়ন্ত সেই অবধি কাউকে কোন কথা না জানিয়ে কল্‌কাতাতেই থেকে গেল। মনটা তার কেবলই ছুটে' যেতো—তরুণী স্থন্দরীদের পানে। কেন যে তার এমন হলো, সে নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌তো না। যে-পাপ সে কোনদিন করেনি, আজ নিজে বঞ্চিত হয়ে সেই পাপেই মন তার লিপ্ত হ'তে চায়। কেবলই যেখানে-সেখানে তার তৃষিত ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি ঘুরে' বেড়ায় সেই না-পাওয়ার গোপন-সন্ধানে!

অবশেষে তার না-পাওয়ার ব্যথা এমনি অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো যে সে নিরুপায়ের উপায় ভেবে' দু-একদিন রূপ-ব্যবসায়ীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে' বেড়ানো স্থরু করে দিলে। মাসের শেষে অফিসের বেতন পেয়ে জয়ন্ত সেদিন এম্‌নি একটা কদর্য্য পল্লীতে ঘুরে' বেড়াচ্ছে, এমন সময় দোতালার উপর থেকে রমণী কণ্ঠের একটা গানের স্থর তাকে প্রলোভনের হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল। কম্পিত পদে ধীরে ধীরে সে ওপরে উঠে যেতেই, রূপসী তরুণী, তার ভরা-যৌবনের ডালি নিয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে' দুটো গান শোনালে। মুগ্ধ পতঙ্গের বেশী দেরী হলো না সে আগুনে ঝাঁপ দিতে। সে তো প্রস্তুত হয়েই ছিল। ক্রমে একদিন নয়, দু'দিন নয়, প্রত্যহ সেই পাপপুরীতে

তার নৈশ-বাসর বেশ জমে উঠ্‌তে লাগ্‌লো এবং একদা কোন্ এক নিভৃত নিশীথে সেই সুন্দরী হস্তের উপহার তরল মদিরা গলধঃকরণ করে' নেশায় মশ্‌গুল্ হয়ে জয়ন্ত জেনেশুনেই সেই অতল তলে ডুবে গেল চিরজনমের মত !

কিন্তু রূপের সঙ্গে তীব্র মদিরার মোহে যখন সে ভর্‌পুর হয়ে গেছে, তখনও তার মন থেকে ঘৃণাহতা নন্দরাণীকে বিদায় দিতে সে কোন প্রকারেই পারলো না! ধিকি ধিকি করে' আগুনের মতন জ্বল্‌তে লাগ্‌লো তার ব্যথিত স্মৃতিটুকু !

পুরো পাচটি বছর এম্‌নি করে' জয়ন্ত তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেরে যখন ফিরে' দাঁড়ালো, তখন আর সে-জয়ন্তর কিছু বাকি নেই। অসৎ সংসর্গে থেকে, রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান এবং নানাবিধ অত্যাচারে তখন তার শরীর ভেঙে গেছে, মনে স্ফূর্ত্তি নেই, দুশ্চিন্তা এবং কুৎসিত ব্যাধিতে সমস্ত দেহ-মন জর্জ্জরিত হয়ে গেছে। একবার মনে হলো,—নিজের ওপর এই নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবার দরুণ ইচ্ছা তার কেন হয়েছিল, এবং যদিই বা হয়েছিল, তবে আমরণ সে তাতেই ডুবে থাকৃতে পারছে না কেন?......কে যেন ডাকে, পিছন

থেকে কার আর্ত্তক্রন্দন যেন তাকে বারে-বারে শুধু ফিরে যেতে বলে।—কে,—সে কে ?...

এতদিন পরে আবার জয়ন্ত নন্দরাণীর কাছে ফিরে গেল। তার দেবতার মত চরিত্র সে তখন হারিয়ে ফেলেছে। এখন তো তার কোনও গন্ধ নেই—সব যে চোখের জলে ডুবে' গেল! নন্দরাণীকে সে তো আর ঘৃণায় পায়ে ঠেলে দিতে পারে না—সে-ই যে এখন তার অযোগ্য স্বামী! স্বামীত্বের গৌরব এবং অধিকার নিয়ে কেমন করে' কোন্ মুখে গিয়ে সে দাঁড়াবে তার চোখের সুমুখে ?

যাক্, তবু সে গেল।

বছরখানেক পরে দেখা গেল, নন্দরাণীর একটি ছেলে হয়েছে। কিন্তু সে-ছেলে প্রায় পাঁচ ছ' মাস রোগ ভোগ করে' গেল মরে।

—তারপর ?

স্বামী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—তারপর আর কি ? নন্দরাণীও মরে' গেল দু তিন সপ্তাহের পর!

স্ত্রী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ সচকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—এঁ্যা, মরে গেল ?—তারপর ?

—আবার কি ?—আ-র কিছু না।

—তোমার সেই বন্ধু জয়ন্ত তাহ'লে আবার দেখে-শুনে একটি বিয়ে করলে ?—

স্বামী আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে খোলা জানালার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। বর্ষাকাল। কখন্ যে হঠাৎ বৃষ্টি নামিয়াছে তাহারা বুঝিতে পারে নাই। বাহিরে তখন বাদলের ধারা যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া তৃষ্ণার্ত্ত তপ্ত পৃথিবীর বুকে ঝম্ ঝম্ করিয়া অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পতি-দেবতা

শীত কিছু বেশী পড়েছে, নয় অনিলা ?

অনিলার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া ললিতা আবার বলিল, —অনিলা ? বেরিয়ে গেছিস্ বুঝি ?

অনিলা সন্ধ্যাপ্রদীপটি তুলসীতলায় নামাইয়া যুক্তকরে দাঁড়াইয়াছিল। ভগবানের কাছে প্রণাম করিতে গিয়া, প্রার্থনা করিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইল না। অমঙ্গল তাহাদের নিত্য-সহচর। মঙ্গলকামনা যাহাদের জন্য, তাহারা সকলেই যখন একে-একে বিদায় লইয়াছে, তখন আর কাহার জন্য কি প্রার্থনা করিবে ?—কিশোরীর বুকের তলা হইতে একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল। চোখের অশ্রু দু' চোখ ভরিয়া ছল ছল করিয়া উঠিল।

অনিলা বাহিরে চলিয়া গেছে ভাবিয়া ললিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখের দৃষ্টি আজকাল ঝাপ্সা হইয়া গেছে, তাই অনিলা কখন্ যে ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছিল, দেখিতে পায় নাই। দৃষ্টি ঘোলাটে হইবার একটু কারণও ছিল। বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ এই

পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবনের হিসাব খতাইয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়, শুধু আঘাতে আঘাতে ললিতার নারী-জীবন ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেছে। স্বামী যে দিন হইতে তাহাকে এই পল্লী-কুটীরে সামান্য একটা মাসহারা দিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া, নিজে একটা বার-নারীর গুণমুগ্ধ হইয়া কলিকাতায় রাজার হালে বাস করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাহার কান্না সুরু হইয়াছে, আজও সে চোখের জলের অবসান হয় নাই। একটা মেয়ে ছিল,—মাত্র অনিলাকে রাখিয়া সেও আজ প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে চিকিৎসা অভাবে মরিয়া গেছে। একটা ছেলে ছিল, সে থাকিত পিতার কাছে কলিকাতায়। আজ তিন মাস হইল, গত ভাদ্রের এক নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সেখান হইতে সংবাদ আসিল, সে-ও তার দুঃখিনী মাতার মায়া কাটাইয়া দিদির কাছেই চলিয়া গেছে! কলিকাতা হইতে ললিতার সপত্নী মহোদয়া করুণা করিয়া একখানি পোষ্টকার্ডের পিঠে এই সংবাদটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন! মরিবার সময় ছেলেটাকে একবার সে চোখের দেখা দেখিবারও অনুমতি পায় নাই। ইহার পরেও যে সে মাত্র চোখের দৃষ্টিটুকু হারাইয়া বাঁচিয়া আছে, ইহাই তাহার চরম দুর্ভাগ্য!

কন্যার মৃত্যুর পর নিজের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ললিতা

অনিলার বিবাহ দিয়াছিল, কিন্তু কুলিনের মেয়ে বলিয়া শ্বশুরবাড়ীর মুখ তাহাকে জীবনে কোনদিনই দেখিতে হইল না। অনিলাকে আহুতি দিবার পূর্ব্বেই কৌলিন্যাভিমানী তাহার প্রৌঢ় স্বামী-দেবতা আরও তিন-চারিটি অনাথার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাদের জাতি রক্ষা করিয়াছিল। অনিলা জানিত নিঃসহায়া কুলিন-কন্যার স্বামীভাগ্য ইহা অপেক্ষা আর বেশী কিছু হইতে পারে না, তাই কোনরকমে নিজের বুকের আগুন বুকেই চাপিয়া রাখিয়া, তাহার আশ্রয়দাত্রী সর্ব্বস্বহারা এই বৃদ্ধা মাতামহীর সেবা-যত্ন করিয়াই দিনগুলা তাহার পার করিতেছিল।

একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরেও, ললিতার বৃদ্ধ স্বামী শ্যাম-সুন্দরবাবু কেমন করিয়া যে সেই বার-বনিতাকে লইয়া কলিকাতায় সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে ছিলেন, এইটাই ললিতার সব চেয়ে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইত। মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন স্বামীকেও একটিবারের জন্য চোখে দেখিতে পাইলেও বা তাহার মনের দুঃখ কতক পরিমাণে কমিতে পারিত, কিন্তু আজ তিন মাসের মধ্যে তাহার দেখা পাওয়া দূরের কথা, গত একমাস তাহার মাস-হারার পনরটি টাকাও বন্ধ হইয়া গেছে।

বৃদ্ধা মাতামহীর নিষেধ সত্ত্বেও অনিলা ভয়ে-ভয়ে তাহার কলিকাতা-প্রবাসী মাতামহের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছিল। চিঠির জবাবের প্রত্যাশা সে করে নাই, তথাপি উত্তরে যে ছুটি কথা ফিরিয়া আসিল, তাহা তাহাদের একেবারে অপ্রত্যাশিত। তিনি লিখিলেন, একটু বেশী শীত পড়িলেই পৌষ-মাসের মধ্যে তিনি একবার আসিবেন।

পৌষের প্রথম হইতেই ললিতা তাহার স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। শীত একটু বেশী পড়িলেই তিনি আসিবেন লিখিয়াছেন, কাজেই প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনিলাকে সে প্রশ্ন করে, এবার কিছু বেশী শীত পড়েছে, নয় অনিলা?

অনিলা বলে, হ্যাঁ এইবার দাদু আসবেন বোধ হয়।

তা'ছাড়া এই কিশোরী নাত্‌নীটির সঙ্গে ললিতার অনেক কথাই হয়। শীতের হিম-আড়ষ্ট পড়ন্ত বেলায় উভয়ে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া থাকে। অনিলা তাহার মৃতা মাতা ও মামার বাল্যকাহিনী স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনিয়া যায়, বলিতে বলিতে দিদিমার ঝাপসা চোখে অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিলে, সে নিজেও খানিক কাঁদে, আবার তাহাকেও সান্ত্বনা দেয়।

এতদিনের পর তাহার নিষ্ঠুর স্বামী করুণা করিয়া তাহার

নিকট আসিলে, ললিতা যে তাহাকে কি বলিবে, প্রত্যহই একটির পর একটি করিয়া কথা সাজাইয়া সেগুলি ঠিক করিয়া লয়—আবার ভুলিয়া যায়, আবার ঠিক করে।

অনিলাকে বলে, তুই তাঁকে কিচ্ছু বল্‌তে পারবি না অনিলা ?

জানি না পার্‌ব কি না, তাঁকে দেখ্‌লেই আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করে।

একান্ত আপনজনের নিকট হইতে স্নেহ-ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কত বড় দুর্ভোগ তাহা সে নিজে বেশ ভাল করিয়াই জানে এবং তাঁহার সহিত কথা বলিতে অনিলার যে ভয় হইবে, ইহা তো অস্বাভাবিক নয় ! তাই ললিতা একথার উত্তরে কিছুই বলিতে পারে না,—কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অন্য কথা পাড়ে।

একখানা কাপড় লইয়া সেদিন কথা উঠিল। ললিতা বলিল, জানিস্ অনিলা, এ কাপড়খানি তোর মামার। তার বয়স যখন বারো-বছর, তখন এই কাপড়খানি তার বাবা তাকে এনে' দিয়েছিল। শুধু এইটি ছাড়া তার চিহ্ন আমার কাছে কিছু নেই।

হারানো ছেলেমেয়ের স্মৃতি-চিহ্নগুলি দেখিলেই ললিতা হা হুতাশ করে আর অনিলাকে কত-কালের কত পুরাতন কাহিনী শুনায়। এমনি করিয়া দুই নাত্‌নী ঠাকুমার দিনগুলা কোন রকমে পার হয়।

সেদিন ললিতা বলিল, চল্ অনিলা, আমরা কাশী চলে' যাই।

অনিলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সেই ভাল দিদিমা।

ললিতার চোখদুইটা জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। সে আজ বহুদিনের কথা,—বধূবেশে যখন সে এই অভিভাবকহীন সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহার কত না আনন্দ! তার পর একটি ছেলে ও মেয়ের মা হইয়া ভবিষ্যতের জন্য কত কল্পনাই না সে করিয়াছিল! একদিন সংসারে যখন অভাব-অনাটন ছিল, তখন সে ছিল তাহার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, আর আজ তার স্বামীর অগাধ ঐশ্বর্য্য, আজ সে কি না সর্ব্বস্বহারা কাঙালিনীর মত স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাস করিবার সঙ্কল্প করিতেছে!

ধরা-ধরা গলায় সে আবার বলিল, কিন্তু অনিলা, আমাদের খাবার সংস্থান সেখানে কেমন করে' হবে ?

অনিলা বলিল, সে জন্যে ভাবনা কি দিদিমা, আমার যে-ক'টা গয়না আছে, তাতে তো একটা বছর চলে যাবে। তারপর কত বড় বড় লোক আছে সেখানে,—কারও বাড়ীতে রান্না করেও কি তোমাকে দু মুঠো খাওয়াতে পারব না ?···খুব পারব দিদিমা।

সুদীর্ঘ চারটি মাস পরে, একদা এক প্রাতে শ্যামসুন্দর বাবু করুণা করিয়া কলিকাতা হইতে গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন, পুত্র-শোকাতুরা পত্নী ললিতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য। এতদিন পরে স্বামী আসিয়াছেন শুনিয়া ললিতার মনে হইতেছিল, তাহার পায়ের তলায় নিজের মাথাটা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলে। কিন্তু সে সুখের মরণেও হয়ত আজ আর তাহার অধিকার নাই!

রান্নাঘরের বাহিরে যে আটচালাটুকু ছিল, সেইখানেই একটা আসন পাতিয়া অনিলা তাহার নবাগত দাদামশাইএর

আহারের স্থান করিয়া দিয়াছিল। খাইতে বসিয়া শ্যামসুন্দরবাবু বলিলেন, তোর দিদিমাকে একবার ডাক্ তো অনিলা!

ললিতা এখনও পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা করে নাই, কেমন করিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে?

অনিলা ঘরে আসিয়া বলিল, দিদিমা, চল দাদু ডাক্‌চেন তোমায়।

ললিতার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,—ওঁর খাওয়া হোক্, তারপর যাব। এক্ষুনি কাছে গিয়েই হয় তো কেঁদে ফেল্‌ব অনিলা, তাঁর খাওয়া হবে না।

আহারাদির পর শ্যামসুন্দর বাবু বসিয়াছিলেন। ললিতা ধীরে-ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে মনে করিয়াছিল, চোখের জলে হয়ত' তাহার বুক ভাসিয়া যাইবে, কি কথা বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে, কিন্তু চোখ দিয়া তাহার এক ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল না, মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না,—তাড়াতাড়ি সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

কত কথা সে বলিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু এ-সময় একটাও

তাহার মনে পড়িল না। বলিল, ছেলেটাকে কোথায় রেখে এলে ?

বলিয়াই কান্না !

শ্যামসুন্দরবাবু বুঝাইলেন, কি কর্‌বে বল,—অমন কত লোকের ছেলে মারা যায়। মহেশপুরের রাজার একটি মাত্র সন্তান, যুবরাজ,—সেও সেদিন মারা গেল।...এমনি-সব অনেক রাজা মহারাজার সন্তানের মৃত্যুর কথা বলিয়া তিনি এই অশিক্ষিতা নারীকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ললিতা থামিতে পারিল না। বলিল,—ছেলেটাকে অমন করে না মেরে ফেল্‌লেই ত' হতো! সে তার দুঃখিনী মা'র কাছে বেশ থাক্‌তো, কেন তুমি তাকে সে রাক্ষসীর কাছে নিয়ে গেলে ?

কোনদিনই এমন কটু কথা ললিতার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, কিন্তু আজ এই সন্তানহারা জননীর মুখ দিয়া যে দুর্ব্বাক্য বাহির হইল, তাহাই শুনিয়া শ্যামসুন্দরবাবু একটু বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, ছিছি! অমন কথা বলো না, বুঝলে, সে তাকে মায়ের মতই সেবা করেছিল।

মা'র মত সেবা করিয়াছিল !

ললিতা আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—তুমি তোমার বুকে হাত দিয়ে সত্যি কথা বল

দেখি, সে কি মরবার সময় একটিবারও তার এই মাকে দেখ্‌তে চায় নি ?—নিশ্চয় চেয়েছিল, তবু তুমি আমায় খবর দাও নি ! এম্‌নি নিষ্ঠুর তুমি।.........যাক্‌, তোমার কাছে আমি অনেক সুখভোগ করেছি, আর চাই না। আমাকে বিদায় দাও, আমি অনিলাকে নিয়ে কাশী যাব।

শ্যামসুন্দরবাবু বলিলেন, কাশী ?...কেন কাশী যাবে কেন ?... তা যদি একান্তই যাবার ইচ্ছে হয়ে থাকে আমি সব বন্দোবস্ত করে' দিতে পারি, তবে কি না...আমার বিবেচনায়...ছাখ, লোকে বল্‌বে কি ?

ললিতা আবার কথা কহিল, বলিল,—হ্যাঁ, তা জানি। ওই লোকে যদি কিছু না বল্‌তো, তাহ'লে তুমি হয়ত 'তাঁকে' ছেড়ে চার মাস কেন,—চার যুগ পরেও আমায় দেখা দিতে আসতে না।...ওই লোকেরাই তো হয়েছে যত নষ্টের মূল।...না, না, লোকে কিছু বল্‌বে না,—আমি তোমার দুটি পায়ে ধরি, আমায় অনুমতি দাও, আমি কাশী যাব। বলিয়াই ললিতা স্বামীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া পা দুইটা জড়াইয়া ধরিতেই চোখের জল হু হু করিয়া গড়াইয়া আসিল।

শ্যামসুন্দরবাবু মনিব্যাগ খুলিয়া একখানা একশ' টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে গেলেন, ললিতা তখনও

পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া ছিল, বলিল, অনিলার হাতে দাও।.........বুঝেছি, যা হারিয়েছি, তার দাম দিতে আস্‌ছ, আমি ও চাইনা—

ললিতা একটু থামিয়া আবার বলিল, আমি চলে গেলে, তাকে নিয়ে সুখে বাস কোরো।

শ্যামসুন্দরবাবু হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন, কথাটা ভাল শুনিতে পান নাই, বলিলেন,—কি ?

আমি তারই কথা বল্‌ছিলুম, যাকে পেয়ে তুমি সবাইকে ছেড়েছ,—নিজের ছেলেটাকেও খুন কর্‌লে—

শ্যামসুন্দর-বাবুর আপাদ-মস্তক এইবার জ্বলিয়া উঠিল; জোরে জোরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বেশ করেছি,—বেরোও তুমি অসভ্য,—ভূত কোথাকার !

এই অপবাদ ললিতার চিরকালের।

পায়ের ধাক্কা খাইয়া দৃষ্টিশক্তিহীনা ললিতা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। দেওয়ালের গায়ে মাথায় আঘাত লাগিতেই একেবারে মাটিতে পড়িয়া গিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। স্বামী তখন জুতার শব্দে ঘর কাঁপাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যে-গাড়ীতে তিনি আসিয়াছিলেন, রাস্তার উপর সেই ঘোড়ার গাড়ীটা অপেক্ষা করিতেছিল;

শ্যামসুন্দরবাবু তাহাতে চড়িয়া বসিয়া কোচ্‌ম্যানকে হুকুম করিলেন, হাঁকাও।

অনিলা অন্যঘরে দাদামশাইএর জন্য পান সাজিতেছিল। তাঁহাকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দিদিমা খাটের নীচে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। কপালে রক্তের ধারা গড়াইয়া নিস্প্রভ অন্ধ চক্ষুদুইটির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ডাকিল,—দিদিমা !...মা !

ললিতা ধীরে-ধীরে অত্যন্ত করুণ-কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, তুমি যাও, আমাদের কাশী যাবার সব জিনিসপত্র ঠিক করে নাওগে দিদি, আমি অনুমতি পেয়েছি।

...সন্ধ্যার পরেই একটু অন্ধকার হইলে, সকলের অগোচরে অনিলার হাত ধরিয়া ললিতা তাহার বহুদিনের স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়া ষ্টেশনের পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা কাশী যাইবে।

* * * *

দিন-পনর পরে দেখা গেল, একখানা মোটর আসিয়া সেই বাড়ীর সুমুখে দাঁড়াইল। মোটর হইতে শ্যামসুন্দরবাবু এবং তাঁহার রক্ষিতা সেই মেয়েটি নামিলেন।

পাড়ায় দু'-একজন ইতর-ভদ্র আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি কহিলেন,—ওঁর স্বাস্থ্য একটু খারাপ হয়েছে, তাই ডাক্তারের পরামর্শে পাড়াগাঁয়ে এলুম চেঞ্জে।

সহর ছাড়িয়া এমন অকস্মাৎ কেন যে তাঁহারা পল্লীগ্রামে আসিলেন, তাহার ইতিহাস আমরা জানি না।

শুধু এইটুকু মাত্র জানি যে, শ্যামসুন্দরবাবুর ভয় ছিল, জাতিচ্যুত হইবার। কিন্তু দেখা গেল, উদার পল্লী-সমাজ সে-সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করিল না। অনর্থক তিনি ভয়ে মরিতেছিলেন। তাঁহাকে জাতিচ্যুত যে করিবে না সেকথা আমরা বহুপূর্ব্বেই জানিতাম। অর্থবানের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার মত সঙ্কীর্ণ মন লইয়া পল্লীবাসী হিন্দুগণ সমাজ গঠন করে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভয়

বেলা তিনটা হইতে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত ষ্টেশনে গাড়ী আসে না। ষ্টেশন খাঁ-খাঁ করে।

ষ্টেশন-মাষ্টার বাসায় চলিয়া যান। এসিষ্ট্যাণ্ট্ যিনি, তাঁহার না থাকিলে নয়। টেলিগ্রাফের যন্ত্র-সাজানো টেবিলটির কাছে একটি টুলের উপর তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে হয়।

খালাসীদের মধ্যে কেহ কেহ বা এই সময়টায় গ্রামের ভিতর চাল-ডাল কিনিতে যায়, কেহ-বা ঘুমায়, আবার কেহ-বা আধ মাইল-খানেক্ দূরে ফটকের কাছে গিয়া জটলা করে।

এই ফটকটি রেল-কোম্পানীর ফটক। পাকা একটি শড়ক এখানে রেল-লাইনের উপর দিয়া পার হইয়া গেছে। শড়কের উপর গাড়ী-ঘোড়া লোকজনের যাতায়াত। আজকাল আবার মোটর-'বাস' চলিতেছে। ট্রেণের সঙ্গে ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা। কাজেই রেল-কোম্পানীকে এখানে একটি ফটক তৈরী করিতে হইয়াছে। এবং শুধু ফটক নয়—ফটকের কাছে টালির একখানি ছোট ঘর। ফটকরক্ষী রামসিংএর জন্য।

খালাসীদের মজলিস বসে রাম-সিংএর এই ঘরখানির মধ্যে। মজলিসের প্রধান আকর্ষণ—রঞ্জন। কালোরঙের পাৎলা ছিপ্‌ছিপে ঢ্যাঙ্গা এবং কুঁজো একটি লোক। কাজকর্ম্ম কোথাও কিছু করে না। ষ্টেশনেই ঘরবাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, কেহ তাহার কোথাও আছে কিনা কে জানে, ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইলে যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া হাত পাতিয়া যাহা পায়—তাহাই লইয়া গিয়া রামসিং-এর কাছে গচ্ছিত রাখে, রাম সিং-এর হাতে-গড়া রুটি খাইয়া তাহার দিন কাটে, রাত্রে ওই ফটকের ঘরের মধ্যে রাম সিং-এর কাছে শোয়।

অদ্ভুত এই রঞ্জন!

খালাসীরা সুবিধা পাইলেই তাহাকে লইয়া জটলা পাকায়। রঞ্জন ভারি মজার মজার গল্প বলে। তাহারা শোনে।

রঞ্জন বলে, তাহার সাহস নাকি অত্যন্ত বেশী।

বলিয়া আরম্ভ করে,—'একদিন—অমাবস্যার রাত। চারিদিকে ঘুট্‌ঘুটে আঁধার। কোলের মানুষ চেনা যায় না। আছি শ্বশুর-বাড়ীতে; বৌ-এর সঙ্গে কয়েকদিন ধরেই ঝগড়া চল্‌ছিল। হঠাৎ সেদিন রাগারাগি হলো। রাত তখন দুপুর। এমন রাগারাগি হলো যে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

বেরিয়ে পড়ে যাই কোথায় ?

বাইরে এসে ভাবলাম—বাড়ী যাওয়া যাক্।

বাড়ী সেখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে। সেই অন্ধকার রাত। হাতে না আছে লণ্ঠন, না আছে একটা ছড়ি।

চল্‌তে লাগ্‌লাম।

চলেছি ত' চলেইছি। ধানের মাঠে-মাঠে রাস্তা। বর্ষাকাল। মাঠে কাদা হয়েছে। ছপ্ ছপ্ করে' মাঠগুলো পার হয়ে উঠ্‌লাম গিয়ে পাকা-রাস্তায়। পাকা-রাস্তার দু'পাশে বাঁশের ঝাড়ে বাতাস লেগে কট্ কট্ করে' শব্দ হচ্ছে, জঙ্গলের মাঝখানে শেয়ালগুলো মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠ্‌ছে। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই! অন্য লোক হ'লে হয়ত মরেই যেতো। আমার সাহস খুব বেশী, তাই সে-সব কিছু গ্রাহ্য না করে' হন্ হন্ করে' এগিয়ে চল্‌লাম।

কিছু দূর গিয়ে রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে ডানহাতি একটা নদী পেরোতে হয়। প্রকাণ্ড নদী। ওপারে হয়ত জল একটুখানি আছে, কিন্তু এপারে শুধু বালি।

নাম্‌লাম নদীতে। জায়গাটার নাম শ্মশান্-ঘাটা। আশ-পাশের গাঁয়ের লোক সেখানে মড়া পোড়ায়। দিনের বেলা সে-পথ দিয়ে হেঁটে যেতে লোকে ভয় করে। আমারও

গা'টা একবার ছম্ করে' উঠ্‌লো। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। ভয় কিসের ? বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। মস্ মস্ করে' শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ কি যেন একটা নরম জিনিষের গায়ে পা ঠেক্‌লো। থম্‌কে দাঁড়ালাম। দেশ্‌লাই থাক্‌লে জ্বেলে দেখ্‌তাম। কিন্তু কিছু নেই! পা দিয়ে নেড়ে-চেড়ে বুঝলাম— হাত, পা, মাথা, চুল—সবই রয়েছে, একটা আস্ত মানুষ! হঠাৎ মনে পড়লো, কিছুদিন আগে শুনেছিলাম, নদীর ধারে দু'তিনখানা গাঁয়ে ভয়ানক কলেরা হচ্ছে। হয়ত সেই কলেরার মড়া। না পুড়িয়ে শ্মশানে ফেলে দিয়ে গেছে। তা হোক্। পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু যেতে গিয়ে, দেখি—চলা দায়। যেদিকে যাই, সেইদিকেই হয়ত কারও হাত মাড়িয়ে ফেলি, কারও পা, কারও-বা মাথার খুলিতে হোঁচট্ খেয়ে পড়তে পড়তে সাম্‌লে নিই। সুমুখেই দেখি, কয়েকটা শেয়াল খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে' চীৎকার করতে করতে ছুটোছুটি করছে, মড়া নিয়ে টানাটানি করে' তারা ঝগড়া বাধিয়েছে হয়ত'।

আরও খানিক্‌টা এগিয়ে যেতেই মনে হলো যেন সেই নদীর মাঝখানে জনকয়েক কালো কালো লোক বসে' বসে' ফিস্ ফিস্ করে' গল্প করছে। ভাবলাম হয়ত তারা গ্রাম থেকে মড়া নিয়ে এসেছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলাম, 'কে ?'

একটা লোক যেন কথা বল্‌তে যাচ্ছিল, মনে হলো বাকি লোকগুলো এক সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ করে' তাকে নিষেধ করলে। ব্যাপার কি বুঝতে পার্‌লাম না।

'কে হে তোমরা কথা কইছ না যে!' বলে যেই একটুখানি এগিয়ে গেছি, দেখি না, সবাই মিলে একসঙ্গে কঁক-কঁক্‌ গঁক্‌-গঁক্‌ করতে করতে বালির ওপর থপ্‌ থপ্‌ করে' লাফিয়ে লাফিয়ে দূরে সরে' গেল।

বুঝলাম, মানুষ নয়, মানুষ বলে' ভুল করেছিলাম। ওগুলো শকুনি।

ভাবলাম, ভূতপ্রেত কত-কি থাকতে পরে, কাজ নেই আর বেশিক্ষণ শ্মশানে থেকে। তাড়াতাড়ি নদীটা পার হয়ে যাই।

তাড়াতাড়ি নদী পার হচ্ছি। সুমুখে জল। জলে নাম্‌তেই দেখি, আমার আগে-আগে জলের ওপর ছপ্‌ ছপ্‌ করে' কে যেন এগিয়ে যাচ্ছে। এবার আর ভাল করে' না দেখে কথা কইব না ভেবে' আমিও তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্‌লাম। কাছাকাছি আস্‌তেই অন্ধকারেও চিন্‌তে পারা গেল—কালো মত লম্বা একটা মানুষ। ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম,—'কে?'

'আমি।'

যাক্‌, বাঁচা গেল। তবু একটা সঙ্গী মিলেছে!

বল্‌লাম, কোত্থেকে আস্‌ছ ? যাবে কোথায় ?

কোত্থেকে আস্‌ছে সে-কথা আর বল্‌লে না। বল্‌লে, 'যাব পাথরকুচি।'

বললাম, 'চল তোমার সঙ্গেই যাই। ভালই হলো।'

পাথরকুচি থেকে আমাদের গ্রাম প্রায় ক্রোশখানেক্ দূরে।

দু'জনে নদী পার হ'লাম।

ওপারে গিয়ে—সে যায় আগে-আগে আমি যাই পিছু-পিছু।

চলা-পথে অনেকদিন হাঁটিনি. ভাবলাম, পাথরকুচির লোক, পথ সে চেনে নিশ্চয়ই। চলুক যেদিকে যাচ্ছে।

দু'একটা কথা জিজ্ঞেস্ করলাম। জবাব দেয় না।

বললাম, 'তুমি কি জা'ত ?'

বললে, 'বাউরি।'

তা হবে। গরীব লোক। সারাদিন খেটেখুটে সন্ধ্যেয় হয়ত মদ খেয়ে কোথাও পড়েছিল। জ্ঞান হ'তেই আবার উঠে সে বাড়ী চলেছে। নেশা হয়ত এখনও ঠিক কাটেনি, তাই ভাল করে কথা বল্‌ছে না।

দু'জনে চলেছি ত' চলেইছি। পথ আর ফুরোয় না।

বল্‌লাম, 'এ কিরে, কোন্‌দিকে চলেছিস্? পথ ঠিক চিনিস্ ত ?'

বললে, 'হ্যাঁ।'

ক'ঘণ্টা চলেছি ঠিক মনে নেই। দু'জনে একটা বাগানের ভেতর গিয়ে ঢুক্‌লাম। পাশেই একটা ইঁটের পাজা। হঠাৎ একটা শব্দ হ'তেই দেখি, ইঁটের পাজার কাছে সাদা একটা বাছুর যেন ছুটোছুটি করছে। পাশেই একটা গাছের কাছে যেন স্বড়ুৎ করে' আর-একটা শব্দ হলো। সেদিকে তাকাতেই দেখলাম, তিনটি ছোট ছোট বেঁটে বামনের মত মানুষ আমাদেরই দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। মানুষ তিনটে অদ্ভুত রকমের। তিনজনেরই মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, পা-গুলো উল্টো দিকে বাঁকানো; ভূতের পা শুনেছি ওইরকম হয়। তবে কি ভূত নাকি?

এতক্ষণে আমার গায়ের লোমগুলো খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো।

খুব জোরে জোরে বলে' উঠলাম,—রাম! রাম!

বাস্‌, যেই 'রাম' 'রাম' বলা, আমার সঙ্গের সেই লোকটা দেখতে দেখতে ওই বামন তিনটের মত ছোট হয়ে গেল। এতক্ষণে বুঝলাম—ওরে শালা, তুমি মানুষ নও,—তুমিও ভূত!

আমি দেখলাম, ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে যদি যাই ত' বেটারা পেয়ে বসবে। আর অন্ধকারে সেই অজানা রাস্তায় যাবই বা কোথায়? বুক ফুলিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

রাম-নাম উচ্চারণ করিতে লাগলাম। ভূত চারটে তখন ইঁটের পাঁজার কাছে সরে গেছে। সেই যে বাছুরের মত যেটাকে দেখেছিলাম, সেটাও ঠিক তাদেরই মত হয়ে সঙ্গীদের কাছে এসে দাঁড়ালো। সেটার রঙটা কিন্তু সাদাই রইলো। সে-ব্যাটা বোধ হয় সাহেব-ভূত। এই পাঁচটা ভূত তখন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচ-দুগুনে দশটা প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা হাত বের করে' আমায় ডাকতে লাগলো—'আঁয়! আঁয়! আঁয়!

রাম-নাম কর্‌ছি আর কি করব ভাবছি, হঠাৎ দূরের গাঁয়ে একটা মোরগ ডেকে উঠ্‌লো। ঠাণ্ডা বাতাস অনেকক্ষণ থেকেই বইছিল। বুঝলাম—সকাল হয়ে গেছে।

বাঁচা গেল।

চারিদিক ফরসা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূতগুলো হঠাৎ আমার চোখের সুমুখ থেকে একে-একে কেমন করে' যে কোন্‌দিক দিয়ে উধাও হ'য়ে গেল বুঝতে পারলাম না।'

এম্‌নি একটি-দুটি নয়,—কত গল্প।

গল্প শুনিয়া শুনিয়া শেষে এমন হইল যে, খালাসীগুলা রঞ্জনের কাছে গল্প শুনিতেও ছাড়ে না, অথচ অন্ধকারে একা কোথাও যাইতে হইলে ভয়ে মরে।

দু'একজন খালাসী রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, এত এত কাণ্ড যে করেছ রঞ্জন, তোমার ভয় কোনোদিন পায়নি ?'

কথাটা রঞ্জন হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। বলে 'পাগল! নিজে ভয় পেলে কি এত-সব করতে পারি, তাহ'লে এতদিন মরেই যেতাম।'

'তা বটে!'

সে কথা সত্যি।

সেদিন সায়েব-ভূতের গল্প চলিতেছিল।

একটা সায়েব-ভূত কেমন করিয়া রঞ্জনের হাত হইতে একদিন একটা পাঁঠার মুণ্ডু কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিল—তাহারই গল্প।

রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা। সন্ধ্যায় একটুখানি জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। তাহার পর চাঁদ ডুবিয়া গিয়া আবার চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেছে।

রামসিং বাহিরে লাইনের ধারে বসিয়া গাঁজা টানিতেছিল। রঞ্জনও গাঁজা খায়।

নিজের খাওয়া শেষ হইলে রামসিং ডাকিল, 'এসো রঞ্জন, টানবে ত' এসো।'

রঞ্জন এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, 'নিয়েই এসো না কল্‌কেটা এইখানে।'

রামসিং বলিল, 'গাড়ী পেরোবে, আমার যাবার উপায় নেই। তুমি এসো।'

চারজন খালাসী বসিয়া বসিয়া গল্প শুনিতেছিল। রঞ্জন তাহাদেরই একজনকে বলিল, 'যা না ভাই, নিয়ে আয় কল্‌কেটা।'

কেহই আর যাইতে চায় না। এ-উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে থাকে।

রঞ্জনও ওঠে না।

সকলেরই মনে কেমন যেন সন্দেহ হইল। একজন খালাসী বলিয়া উঠিল, 'কেন, তোমারও ভয় পাচ্ছে নাকি রঞ্জন?'

রঞ্জন খুব জোরে হো হো করিয়া খানিকটা হাসিয়া বলিল, 'দূর্ বোকা! হাতী-ঘোড়া গেল তল্.....শেষকালে কিনা এই কল্‌কে আন্‌তে যেতে আমার ভয়! তোরা সব হলি কি রে! আমি এত এত কাণ্ড কর্‌লাম আর তোরা এই সমান্য ঘর থেকে বেরিয়ে কল্‌কেটা এনে দিতে পারিস না?'

রঞ্জন আর কিছুতেই উঠে না। বলে, 'শোন্, তারপর কি হলো শোন!' বলিয়া তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত গল্পটি আবার আরম্ভ

করিবার আগে একবার গলাটা তাহার পরিষ্কার করিয়া লয়। ওদিকে গাঁজার কলিকার আগুন হয়ত নিভিয়া গেল ; মন তাহার পড়িয়া থাকে সেইখানেই। অথচ সেখানেও যাইতে পারে না, গল্পও তেমন জমে না।

অবশেষে রামসিং নিজেই উঠিয়া আসিয়া কলিকাটা রঞ্জনের হাতে দিয়া তাহাকে এই অবস্থা-সঙ্কট হইতে বাঁচায়।

কিন্তু তাহার এই অনুরক্ত শ্রোতাকয়টির সেইদিন হইতে মনে কেমন যেন একটা খটকা লাগিয়া থাকে।

তবে কি রঞ্জনের সব বানানো গল্প নাকি ?

সত্য গোপন করিয়া চিরকাল ধরিয়া একটা মানুষ কখনও পৃথিবীর আর-সকলকে ঠকাইতে পারে না। সত্য একদিন প্রকাশ হইয়া পড়ে। সে নিজে ঠকে।

রঞ্জনের বেলাও তাহাই হইল।

একটু একটু করিয়া একদিন সকলে জানিয়া ফেলিল যে, রঞ্জন অত্যন্ত ভীতু। তাহাই সে গোপন করিয়া এতদিন সকলকে উল্টা বুঝাইয়াছে।

তখন আর যায় কোথা !

খালাসীরা তাহাকে ক্ষেপাইতে থাকে। যে তাহাকে দেখিতে পায় সে-ই একটুখানি বলিতে কসুর করে না।

'কি হে, রঞ্জন যে! বল না তোমার সেই মামদো-ভূতের গল্পটা, বল না শুনি।

'আচ্ছা রঞ্জন, কেমন করে' তুমি ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলে?

'ক'বার করেছিলে মনে আছে?

রঞ্জনের কালো মুখও লাল হইয়া উঠে। কখনও-বা তাহাদের ধমক্ দিয়া সরাইয়া দেয়, কখনও-বা নিজেই সরিয়া পড়ে।

ক্ষেপায় না শুধু রামসিং। সে-ই তাহার একমাত্র আশ্রয়!

ফটকের ঘরে গল্প বলার মজলিস এখন ভাঙ্গিয়াছে।

বেলা তিনটা হইতে ছ'টা পর্য্যন্ত সময়টা এখন যেন তাহার আর কাটিতেই চায় না। রামসিং-এর কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কখনও-বা বসিয়া বসিয়া গাঁজা টানে।

গাঁজা টানিতে টানিতে তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা হয়।

রামসিং বলে, তাহার আপনার বলিতে আর কেহ নাই।

রঞ্জনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে, 'আমারও। একটি

মেয়ে ছিল তার শ্বশুরবাড়ীতে। কচি একটি মেয়ে রেখে শুন্‌ছি সেটাও মরেছে।'

এমনি করিয়া এই দুই আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবহীন প্রৌঢ়ের দিন কাটিতে থাকে।

রামসিং বলে, 'আমি আর বাঁচব না ভাই।'

রঞ্জন বলে 'আমিও।'

কিন্তু মরা-বাঁচার কর্ত্তা যিনি, তিনি হয়ত ইহাদের এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া অলক্ষ্যে থাকিয়া একটুখানি হাসেন।

মরিব বলিলেই মরা হয় না।

মৃত্যু যখন আসে তখন একেবারে অকস্মাৎ আসিয়া পড়ে। কাহারও মুখ চাহিয়া কখনও সে থমকিয়া দাঁড়ায় না।

বছরখানেক পরে রামসিং সত্যই একদিন শয্যা গ্রহণ করিল এবং সাতদিন ক্রমাগত জ্বর-ভোগের পর একদিন সকালে সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল 'রঞ্জন!'

রঞ্জন কাছেই বসিয়াছিল। বলিল, 'কি।'

রামসিং বলিল, 'চললাম।'

'সে কি রামসিং! ছি, ওকথা বলতে নেই।'

বলিয়া বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া রঞ্জন কাঁদিয়া ফেলিল।

চোখের জল গোপন করিবার জন্য যেমনি সে মুখ ফিরাইয়াছে রামসিং আবার ডাকিল, 'রঞ্জন!'

চোখ মুছিয়া রঞ্জন বলিল, 'কি! কি হয়েচে তোমার বল ত' রামসিং?'

রামসিং বলিল, 'বুকের ভেতরটা আমার কেমন যেন করছে রঞ্জন। কেউ আমার নেই জানি, তবু আজ মরতে কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে ভাই!'

শিয়রের কাছে রঞ্জন চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল।

রামসিং তাহাকে আরও কাছে সরিয়া আসিতে বলিয়া চুপি চুপি বলিল, 'কিছু টাকা আছে। অনেক দিন থেকে জুগিয়ে রেখেছিলাম। তোমাকেই দিয়ে গেলাম, তুমি খরচ কোরো।'

বলিয়া সে তাহার বালিসের তলাটি দেখাইয়া দিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

তাহার পরও সে আধঘণ্টা বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু তাহাকে ঠিক বাঁচিয়া থাকা বলে না, সে যেন মৃত্যুকে প্রাণপণে ঠেকাইয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

চেষ্টা সফল হইল না।

আরও দশজন ঠিক যেমন করিয়া মরে রামসিংও মরিল ঠিক তেমনি করিয়াই।

রাত্রি তখন প্রভাত হইয়াছে।

ষ্টেশন-মাষ্টার নিজে কয়েকজন খালাসী এবং রঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া শবদাহ করিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া যখন আসিলেন বেলা তখন প্রায় দুইটা।

সকলেই বলিতে লাগিল, 'বুড়ার টাকা ছিল।'

ষ্টেশন-মাষ্টার রঞ্জনকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ত' শেষ পর্য্যন্ত কাছেই ছিলে ওর, টাকা-কড়িগুলি কি করলে বল দেখি?'

রঞ্জন এদিক-ওদিক তাকাইয়া ঢোক গিলিয়া বলিল, 'কই টাকাকড়ির কথা ত' কিছু আজ্ঞে,—জানিনা আমি!'

কথাটা রঞ্জন গোপন করিল।

ভাবিয়াছিল, দুনিয়ায় তাহার আর নিজের বলিতে কেই-বা আছে, খাইতে পরিতে দিবারও কেহ নাই, সুতরাং রামসিংএর এই টাকার কথা কাহাকেও সে বলিবে না। তাহাই লইয়া সে যেখানে হোক্ চলিয়া যাইবে এবং এই টাকাগুলি ভাঙ্গিয়াই জীবনের বাকি কয়টা দিন কাটাইয়া দিবে।

ষ্টেশন-মাষ্টার বিশ্বাস করিলেন না।

বলিলেন, 'এখন তুই কি করবি ভেবেচিস? থাকবি কোথায়?'

রঞ্জন বলিল, 'এই খানে যেখানে-হোক্ পড়ে' থাক্‌ব হুজুর।'

'খাবি কি? গাঁজার পয়সা কে জোগাবে?'

রঞ্জন কি জবাব দিবে প্রথমে ভাবিয়া না পাইয়া হাত-জোড় করিয়া ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, 'গাড়ীতে গাড়ীতে ভিক্ষে করব হুজুর, দু'-এক পয়সা যা পাই...'

তাহার কান্না দেখিয়া মাষ্টারের দয়া হইল। বলিলেন, 'তার চেয়ে তুই এক কাজ কর্ রঞ্জন। রামসিং-এর কাজটা তুই নে। ওই ঘরে গিয়ে থাক্, আঠারো টাকা মাইনে, মন্দ কি, তোর ভালই হবে।'

কিন্তু তাহাতে রঞ্জনের আপত্তি আছে।

দিনের বেলা কাজ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু রাত্রে—ওখানে ওই নিরিবিলি জায়গায় একা, তাহার উপর রামসিং যে ঘরে তাহার চোখের সুমুখে মরিয়াছে, সেই ঘরে বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

ষ্টেশন-মাষ্টার হাসিলেন। রঞ্জনের সাহসের কথা তখন জানাজানি হইয়া গেছে। তিনিও জানিতেন। বলিলেন,

'চুপ করে' রইলি যে ? ভয় পাবে ? দূর বোকা ! ভয় কিসের ?'

এমন সময় ঘরের ভিতর ক্রিং ক্রিং করিয়া টেলিগ্রাফের ঘণ্টা বাজিল। মাষ্টার-মশাই ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাহার স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই আর সেদিন হইল না। একজন খালাসী গিয়া রামসিংএর কাজ করিতে লাগিল।

ষ্টেশন-ঘরের বাহিরের বারান্দায় ওজন-করা লোহার যন্ত্রটার উপর কাপড় গায়ে দিয়া জড়োসড়ো হইয়া রঞ্জন দিবারাত্রি শুইয়া থাকে।

মাষ্টার-মশাই লোকটি খুব ভাল মানুষ। প্রথম দিন তাহাকে তিনি বাসায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া এক পাতা ভাত দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিন কেহ আর তাহাকে ডাকে নাই।

ট্রেণের কয়েকজন যাত্রীর কাছে ভিক্ষা করিয়া তিন আনা পয়সা পাইয়াছিল। তাই দিয়া দুপুরে সে গাঁজা কিনিয়া আনিয়া ফটকের কাছে বসিয়া বসিয়া সারাদিন সে গাঁজাই খাইয়াছে আর ভাবিয়াছে—কি করা যায় !—

খালি-পেটে গাঁজা টানিয়া নেশা তাহার বেশ ভালই ধরিয়াছিল, সন্ধ্যার আগেই সে ফটকের কাছ হইতে উঠিয়া আসিয়া আবার তাহার সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে আসিয়া বসিল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল মনে নাই। সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই রঞ্জন তাহার কোমরে হাত দিয়াই চমকিয়া উঠিল। এদিক-ওদিক হাতড়াইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, রামসিং-এর-দেওয়া তাহার সেই টাকার থলেটি উধাও!

কে লইয়াছে, কেমন করিয়া লইয়াছে কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। এ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই, চেঁচাইয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে পারে না,—কি যে করিবে বুঝিতে না পারিয়া হতভম্বের মত রঞ্জন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

মাথাটা তাহার ঘুরিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, তাহার চোখের সুমুখে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও যেন ঘুরিতেছে!

একটি দিনের মধ্যেই রঞ্জনের অবস্থা হইল ঠিক পাগলের মত। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, এই একটি দিনেই তাহার বয়স যেন বাড়িয়া গেছে। চোখ দুইটা কোটরে ঢুকিয়াছে, গাল দুইটি বসা, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, দৃষ্টি উদাস! একদিকে যাইতে আর-একদিকে যায়, ডাকিলে সাড়া দেয় না, কি বলিতে যে কি বলে নিজেই তাহা বুঝিতে পারে না।

টাকার শোকে পুরা দু'টি দিন সে জলগ্রহণ করিল না।

তিন দিনের দিন গলা দিয়া আর কথা বাহির হয় না। একেবারে মরিবার মত অবস্থা!

ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহার বাসা হইতে ষ্টেশনে আসিতেছিলেন, হঠাৎ পথের মাঝখানে হাতজোড় করিয়া টলিতে টলিতে রঞ্জন তাঁহার পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল।—'হুজুর!'

'কিরে! এ কি চেহারা তোর?'

রঞ্জন বলিল, 'ফটকের চাকরিটি আমায় দিন।'

মাষ্টার-মশাই বলিলেন, 'দিতেই ত' চেয়েছিলাম রে গাধা!'

রঞ্জন বলিল, 'আজ তাহ'লে আমি আমার ছোট নাৎনীটিকে নিয়ে আসি হুজুর। তাকেই কাছে রাখব।'

মাষ্টারের দয়া হইল। বলিলেন, 'তাই যা। আমার বাসায় খেয়ে যাস্।'

দু'দিন না খাইয়া অন্তরাত্মা তাহার কাঁদিতেছিল; খাবার নামে মাষ্টার-মশাই-এর পায়ের কাছে একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া একটি প্রণাম করিয়া বলিল, 'যে-আজ্ঞে।'

ফটকের চাকরিটি করিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না, তবু তাহাকে করিতে হয়।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা!

মানুষ দেয় ত বিধাতা দেয় না। টাকাগুলি থাকিলে এ-কষ্ট আর সহ্য করিতে হইত না।

সাত বছরের ছোট নাৎনীটি! নাম কালী, পায়ে মল, নাকে নোলক,—চব্বিশ-ঘণ্টা দাদামশাই-এর কাছে-কাছে থাকে, রান্নার সময়ে এটা-সেটা যোগাড় করিয়া দেয়, শুক্‌নো কাঠ কুড়াইয়া আনে, ফুঁ দিয়া দিয়া উনান ধরায়, এক-একদিন তরি-তরকারি আনিবার জন্য একলাই সে হাটে যায়। দূর হইলেও হাটে যাওয়ার কষ্ট কিছুই নাই। যাইবার সময় রঞ্জন তাহাকে 'বাসে' চড়াইয়া দেয়, পানিহাটির হাটের কাছে পথের ধারে গিয়া নামে, আসিবার সময় আবার 'বাসে' চড়িয়া চলিয়া আসে। বাস ওয়ালারা সকলেই তাহাকে চেনে। টিকিট করিতে হয় না।

রঞ্জন দিনের বেলা বলে, 'কালী, ঘুমো।'

তাহার পর সন্ধ্যা হইতে তাহার জাগিবার পালা। ঘুম পাইলেও রঞ্জন তাহাকে ঘুমাইতে দেয় না। গল্প বলিয়া বলিয়া জাগাইয়া রাখে, কোনোদিন যদি-বা ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে ত' রঞ্জন তাহাকে সজোরে একটা চিম্‌টি কাটিয়া দেয়, শেয়াল ডাকিলে ভয় দেখায়, গাছের তলার অন্ধকারটাকে দেখাইয়া বলে, 'ওইখানে ভূত আছে, ঘুমোলেই ধরে' নিয়ে যাবে।' বলিয়া নিজেই সে চোখ বুজিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে।

কিন্তু কালীর সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! দিনের বেলা যতই সে ঘুমাক্ না কেন, সন্ধ্যা হইলে রাজ্যের ঘুম আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে, চোখ দুইটা ছোট হইয়া আসে। রঞ্জনের পায়ের কাছে মাটির উপরেই সে ঘুমাইয়া পড়িতে চায়।

রঞ্জন বলে, 'আসুক্ তবে রামসিং, ধরুক্ তোকে!'

রামসিংএর আসা তেমন আশ্চর্য্য কিছু নয়!

সেদিন সে রাত্রের ট্রেণখানা পার করিয়া উত্তর দিকের ফটকটা বন্ধ করিবে, এমন সময় রাস্তার ধারের ওই বাঁশগাছের তলা হইতে এমন একটা শব্দ তাহার কানে আসিয়া ঢুকিল যে, সে না পারিল ছুটিয়া পলাইতে, না পারিল সাহস করিয়া আগাইয়া দেখিতে!—অবিকল রামসিং-এর গলার কাশির খুকখুক্ শব্দ! কালী ছিল দূরে দাঁড়াইয়া, তাহাকেও কাছে ডাকিবার মত সামর্থ্য নাই, রঞ্জনের আপাদ-মস্তক তখন শিহরিয়া উঠিয়াছে, মাথার ভিতরটা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, পা-দুইটার অবস্থা নিতান্ত খারাপ,—সে যেন কাঠের পা! না পারে আগাইতে, না পারে পিছাইতে!

আর-একদিন অম্‌নি—রাত্রি তখন দুইটা বাজিয়া গেছে, সাড়ে-তিনটার গাড়ীটা পার করিবার জন্য রঞ্জনের ঘুম ভাঙিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি। কালী আর কিছুতেই উঠে না!

যত উঠাইবার চেষ্টা করে, ততই সে হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। অবশেষে ভাবিল, সে নিজেই বাহির হইবে। হাতে লণ্ঠন—ভাবনা কি! রামসিং তাহার অনিষ্ট কিছু করিবে না।

সাহসে ভর করিয়া হড়াম্ করিয়া দরজা খুলিয়া যেমন্ বাহির হওয়া আর অম্‌নি—

'বাপ্‌রে!'

বলিয়া লণ্ঠন-সমেত ডিগ্‌বাজি খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে রঞ্জন একেবারে ফটকের কাছে!

মরে নাই—এই তাহার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য!

হাত ফুটিয়াছে, নাক ফুটিয়াছে, পায়ের খানিকটা ছড়িয়া গিয়া রক্ত পড়িয়াছে। লণ্ঠনের কাঁচটা অত্যন্ত পুরু, ছিট্‌কাইয়া দূরে পড়িয়াও সেটা ভাঙ্গে নাই।

সেইদিন হইতে তাহার ধ্রুব বিশ্বাস—রামসিং এখনও সে জায়গাটার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখনও সে রোজই সেখানে আসে। সাদা ধপ্‌ধপে কাপড় পরিয়া খড়ম্ পায়ে দিয়া দরজার কাছে হাত পাতিয়া সে গাঁজা খাইতে চায়!

সেদিন তাহাকে সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

রঞ্জনকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, এবং ভালবাসিত বলিয়াই বোধ করি সেদিন সে তাহাকে ভয় পাইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া

তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা না হইলে কলিকাটা হয়ত চাহিয়াই বসিত।

রঞ্জন ভাবে তাহার সাহস আজকাল অত্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়াই এখানে সে কাজ করিতে পারে, অন্য লোক হইলে কবে পালাইত তাহার ঠিক নাই।

অন্ধকার রাত্রে একটুখানি বাতাস বহিলেই রাস্তার পাশে বাঁশ-ঝাড়গুলা ঝড়্ ঝড়্ কট্ কট্ করিয়া নানারকম শব্দ করিতে থাকে, 'বাস্' চলাচল থামিবামাত্র শেয়াল-ডাকা স্রুরু হয়, তাহার উপর ভূতের উৎপাত!

যে তাহার টাকা চুরি করিয়াছে রঞ্জন তাহাকে মনে-মনে অভিসম্পাৎ করে। আজ যদি তাহার সে টাকাগুলি থাকিত! হায় হায়, বৃথাই তাহা হইলে এ লাঞ্ছনা তাহাকে আর সহ্য করিতে হইত না। হে ভগবান্! যে তাহার টাকা লইয়াছে সে যেন মরে। ওই টাকা তাহার যেন শ্রাদ্ধে খরচ হয়!

বলিতে বলিতে ঝর্ ঝর্ করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলে।

এম্নি করিয়াই দিন চলে।

কালী এখন বেশ বড় হইয়াছে। রান্নাবান্না নিজেই করে। কিন্তু ঘুম তাহার এখনও ঠিক তেমনিই আছে।

রঞ্জন তাহাকে গালাগালি দেয়।—'মর্ হারামজাদী, ওই ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই মর্ তুই।'

কালী হাসে। বলে, 'এত গালাগালি কেন দাও বলত' তুমি, লোকে শুন্‌লে যে হাসে!'

রঞ্জন আজকাল সমস্ত দুনিয়াটার উপরেই সর্ব্বদা চটিয়াই থাকে। বলে, 'হাসে ত' তোর কি হারামজাদী! তুই মর্ না! মলেই ত' আমি বাঁচি।'

'আমিও বাঁচি।' বলিয়া কালী রাগ করিয়া ঘরের কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

রঞ্জন তখন আবার নিজেই ধীরে-ধীরে উঠিয়া যায়। গায়ে হাত দিয়া বলে, 'রাগ করেছিস দিদি? ছি! বুড়োর উপর রাগ করতে আছে?'

বলিয়া নিজেই খানিকটা কাঁদে। বলে, 'আমার কপাল! নইলে এত লোক মরে, আর আমি বেঁচে থাকি।'

ফটকের দক্ষিণ দিকে মাইলখানেক দূরে ছোট্ট একখানি গ্রাম, নাম—হরিশপুর।

হরিশপুরে সেদিন এক মহা অঘটন ঘটিল। বিদেশী এক

ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন—গ্রামে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী করিতে। ভাবিয়াছিলেন, ছোট গ্রাম, ওখানে বসিলে হয়ত পয়সা-কড়ি হইতে পারে। তাই শহর ছাড়িয়া একা আসিয়া হরিশপুরে তিনি বাস করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল—ভবিষ্যতে উন্নতি যদি কোনোদিন করিতে পারেন তখন মেয়েছেলে আনিবেন।

কিন্তু এম্‌নি বিধির নির্ব্বন্ধ যে, মেয়েছেলে তাঁহাকে আনিতে হইল না, হঠাৎ সকালে একদিন তাঁহার কলেরা হইল এবং সেই নির্ব্বান্ধব অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন হইতে বহুদূরে রাত্রি আটটার সময় হরিশপুর গ্রামেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

কলেরা হইবার পর হইতেই গ্রামের লোক সেবা-যত্নের ত্রুটি কিছুই করে নাই। দুপুরে তাঁহার বাড়ীতে একখানা টেলিগ্রামও করিয়াছে কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত দেশ হইতে কেহ আসিয়া পৌঁছে নাই।

মুস্কিল বাধিল সৎকারের ব্যবস্থা লইয়া। মৃতদেহ এমন করিয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া রাখা চলে না, তাহার উপর কলেরা রোগী, গ্রাম হইতে যত শীঘ্র বাহির করিয়া দেওয়া যায় ততই ভালো, অথচ মুখাগ্নি করিবার লোক একজন দেশ হইতে না

আসা পর্য্যন্ত কি-ই বা করা যায়—এই লইয়া সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল।

শীতকাল। এম্‌নিই সহজে লোকজন ঘরের বাহির হইতে চায় না, তায় আবার রাত্রিকালে ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করিয়া শ্মশানে যাইতে কেহই প্রথমে রাজি হইল না। পরে জনকয়েক ছোকরাকে অতিকষ্টে রাজি করাইয়া ডাকিয়া আনা হইল। বাড়ী-বাড়ী কাঠ-কয়লা সংগ্রহ করিয়া গাড়ী বোঝাই দিয়া একজন চাষার ছেলে সেগুলা সর্ব্বাগ্রে শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া আসিল। যে চারজন লোক দয়া করিয়া শবদাহের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কথা হইল, মৃতদেহটিকে তাহারা গ্রাম হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়া ফটকের কাছে কোথাও নামাইয়া রাখিয়া অপেক্ষা করিবে। এখনও যখন লোকজন কেহ তাঁহার দেশ হইতে আসিল না, রাত্রি সাড়ে-বারোটা কিম্বা দেড়টার ট্রেণে নিশ্চয়ই আসিবে, এবং আসিলে তাহাকে ওই ফটকের পাশ দিয়াই গ্রামে আসিতে হইবে, সুতরাং ওই পথে তাহাকে একেবারে শ্মশানে লইয়া যাওয়াই ভালো।

সেদিন বোধকরি অমাবস্যার রাত্রি। কোলের মানুষ চেনা যায় না—এত অন্ধকার। একজন লণ্ঠন লইয়া আগে আগে চলিল, আর বাকি চারজনে ছোট একটি দড়ির খাটিয়ায় মৃতদেহ

লইয়া পশ্চাতে চলিতে লাগিল। চারজনে ভারি মৃতদেহ অতখানা পথ বহিয়া লইয়া যাওয়া শক্ত। মাঝে মাঝে নামাইয়া কাঁধ পাল্‌টাইয়া ফটকের কাছে তাহারা যখন আসিয়া পৌছিল, সাড়ে-বারোটার গাড়ীটা তখনও আসে নাই। সবেমাত্র একটা 'বাস্‌' পার হইয়া গেল বলিয়া ফটক তখনও খোলা। রঞ্জনের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল! দেখা গেল, সে খাইতে বসিয়াছে।

শব-বাহকেরা পরামর্শ করিল যে, জানিতে পারিলে রঞ্জন হয়ত মৃতদেহ এখানে নামাইতে দিবে না সুতরাং তাহাকে কিছু না জানানোই উচিত।

এই ভাবিয়া নীরবে তাহারা ফটক পার হইয়া খাটিয়াটাকে ধীরে-ধীরে লাইনের পাশে নামাইয়া রাখিয়া সকলে মিলিয়া রঞ্জনের ঘরের দরজার কাছে গিয়া ডাকিল, 'কি করছ রঞ্জন, খেতে বসেছ নাকি?'

এত রাত্রে লোকজন দেখিয়া রঞ্জন অবাক্‌ হইয়া একবার তাহাদের মুখের পানে তাকাইল। কিন্তু কাহাকেও ভাল চিনিতে না পারিয়া বলিল, 'কে?'

গুরুপদ বলিল, 'আমি গুরুপদ—হরিশপুরের। চিন্‌তে পারছ না?'

গুরুপদকে রঞ্জন চেনে। বাজারের ফেরত 'বাস্' হইতে নামিয়া প্রায়ই সে রঞ্জনের কাছে গাঁজা খাইয়া যায়।

গুরুপদ বলিল, 'খাও, ততক্ষণ আমরা তামাকটা তৈরি করি। সাড়ে-বারোটার গাড়ীতে একজন লোক আসবে ভাই, কে আর যায় ষ্টেশন পর্য্যন্ত, ভাবলাম, এই পথেই ত' আস্‌বে, তার চেয়ে এইখানে বসে' বসে' তামাকটাও খাওয়া যাক্, গল্পও করা যাক্।'

এত রাত্রে গল্প করিবার লোক পাইয়া রঞ্জন অত্যন্ত খুশী হইয়াই তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া বাহিরে আসিল।

গাঁজা খাইয়া গল্প করিতে করিতে ট্রেণ আসিয়া পৌছিল।

কিন্তু বসিয়া বসিয়া আরও এক ছিলিম গাঁজা খাইয়া তাহারা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও দেখিল, হরিশপুরের কোনও লোক সে-পথ দিয়া পার হইল না। এ ট্রেণেও কেহ আসে নাই।

আবার সেই রাত্রি দেড়টায় ট্রেণ।

তাহার পর তিনটায়।

রঞ্জন বলিল, 'নিয়মকানুন সব ঘন-ঘন বদলাচ্ছে। বুঝ্‌লে গুরুপদ, আগে বেশ ছিল। আমার হয়েছে মুস্কিল। রাত জেগে-জেগে হয়রাণ হয়ে গেলাম ভাই।'

গুরুপদ জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহ'লে ত' সারারাতই তুমি এক রকম জেগে রইবে বল ?'

বাহাদুরী করিয়া রঞ্জন বলিল, 'জেগে কি রকম ? এই শীতকালে ঠায় এই পথের ধারে বসে বসে আমায় পাহারা দিতে হয় সেই তিনটে পর্য্যন্ত। তিনটের পর একটু গড়িয়ে নিই। অভ্যেস্ হয়ে গেছে, বুঝ্‌লে গুরুপদ, অভ্যেস্ হয়ে গেছে।'

গুরুপদ তাহার সঙ্গীদের চোখের ইসারা করিয়া বলিল, 'আর কেন, ওঠো তাহ'লে ! উঠি রঞ্জন।'

এতক্ষণ বেশ ছিল। রঞ্জন বলিল, 'বসোই না। দেড়টার ট্রেণ আর কতক্ষণ ! দেখেই যাও।'

'না, সে আর আসবে না বোধ হয়।' বলিয়া গুরুপদ তাহার সঙ্গীদের ফটকের বাহিরে লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'যাহয় হবে এবার, দেখা যাবে কাল সকালে। শীতে আর আমাদের কর্ম্মভোগ কেন, চল বাড়ী যাই।'

বাড়ী যাইবার ইচ্ছা সকলেরই। কিন্তু তবু এ ব্যাপারটা কেমন যেন কাহারও উচিত বলিয়া মনে হইল না। মৃতদেহ পড়িয়া রহিল পথের পাশে—তাহারা বাড়ী চলিল—

অনুচিত বুঝিয়াও এক-পা এক-পা করিয়া আগাইতে

আগাইতে তাহারা মাঠের মাঝে অনেকখানি পথ চলিয়া আসিল।

হঠাৎ সেই ঘন অন্ধকার শীত-রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে কাহার যেন একটা বিকট চীৎকার তাহাদের কানে আসিয়া বাজিতেই সকলেই একসঙ্গে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

উৎকর্ণ হইয়া আবার তাহারা শুনিবার চেষ্টা করিল কিন্তু আর-কিছুই শোনা গেল না।

গুরুপদ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'ব্যাটা দেখেছে এইবার। দেখেই হয়ত আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠেছে। বুঝলি?'

সকলেই একটুখানি কৌতুক অনুভব করিল। বলিল, 'ঠিক্। তাই বটে।'

বলিয়াই আর সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া আবার তাহারা পথ চলিতে লাগিল।

পথের ধারে একটা চণ্ডীমণ্ডপে আলো জ্বালিয়া আগা-গোড়া মুড়ি দিয়া বসিয়া তখনও পর্য্যন্ত জনকয়েক মুরুব্বি-মাতব্বরগোছের লোক ডাক্তারবাবুর এই আকস্মিক মৃত্যুর কথা লইয়াই আলোচনা করিতেছিল, এত শীঘ্র তাহাদের শ্মশান হইতে

ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হয়ে গেল এরই মধ্যে? সে কি রে?'

আগাগোড়া ব্যাপারটা গুরুপদ তাহাদের জানাইয়া বলিল, 'আমরা আর পারব না বাপু এই শীতের রাতে মড়া আগ্‌লে বসে' থাক্‌তে, তোমরা যাহোক্ এর ব্যবস্থা-টেবস্থা কর।'

কিন্তু সকলেই তাহাদের দোষ দিতে লাগিল।

'ছি ছি, তোরা করেছিস্ কি! লোক না এলো, অপেক্ষা করতে না পারলি,—তোরা দাহ করেই ফিরে' এলি না কেন? রাত্রিকাল—মড়া ফেলে দিয়ে এলি, শেয়ালে-কুকুরে টানাটানি করবে। ছি বাবা ছি, চল্—আমরাও যাই, চল হে চল, আহা বিদেশী ব্রাহ্মণ—'

বলিতে বলিতে সেই পথেই তাহাদের আবার ফিরাইয়া লইয়া বৃদ্ধেরাও চলিল।

গুরুপদ সারারাস্তা শুধু এই কথা বলিতে বলিতে চলিল যে, না, এত বোকা-বেকুব্ তাহারা নয়, মড়াটাকে শেয়াল-কুকুরে টানাটানি কখনই করিবে না। মৃতদেহ তাহারা নিরাপদ স্থানেই রাখিয়া আসিয়াছে, রঞ্জন সারারাত জাগিয়া সেখানে পাহারা দিবে।

তাহারা ফটক পার হইয়া লাইনের ধারে গিয়া দেখিল,

তাহারা যাহা বলিয়াছিল ঠিক তাই। রঞ্জন পাহারা দিতেছে কি না কে জানে, তবে দেখা গেল, মৃতদেহের অত্যন্ত সন্নিকটে সে শুইয়া রহিয়াছে।

শুইয়া থাকিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া হাতের লণ্ঠন দুইটা তুলিয়া তাহারা যাহা দেখিল, তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি ভয়াবহ! রঞ্জন বোধকরি মৃতদেহের ঢাকা খুলিয়া দেখিতে গিয়াছিল, এবং দেখিতে গিয়া ভয়ে সে আঁৎকাইয়া চীৎকার করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়াছে।

ঘুরিয়া পড়িয়া আর উঠিতে পারে নাই।

দারুণ ভয়ে তাহার হৃৎস্পন্দন সহসা বন্ধ হইয়া গেছে।

বন্ধু গুরুপদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'সেই যে শব্দ—বলেছিলাম না!—আমার অনুমান কখনও ব্যর্থ হয় না।'

* * * *

রঞ্জন বলিত, 'নাৎনীটা শুধু ঘুমোতেই এসেছে।'

সে-কথা সত্য।

কালীর ঘুম তখনও ভাঙ্গে নাই। বাহিরে যে এতবড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেছে তাহার বিন্দুবিসর্গও সে জানে না।

না জানাই ভালো।

আহা ঘুমোক!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

খোলার বস্তি। বাঁশের ব্যাকারির উপর মাটি-লেপা দেওয়াল। মানুষের খোঁয়াড় বলিলেও চলে।

গাঁদার বড় ছেলেটা মোটর-কারখানায় গাড়ী ধোয়ার কাজ করে, মেজটা যায় বিড়ির কারখানায়। সকালে তাহাদের চা তৈরী করিয়া দিতে হয়। গাঁদা উনান ধরায়।

কয়লার ধোঁয়া তাহার ছোট খুপ্‌রিটি ছাড়াইয়া আমার ঘরেও আসিয়া জমিতেছিল। উঠানেও নজর চলে না। শীতের সকালে, রাজ্যের ধোঁয়া এই বস্তির চারি ধারে কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। রাম-রসিকের চালার চুল্লিতে কড়াই চাপে, তেলের জিলিপি তৈরী করিয়া কোথায় কোন্ দোকানে সে বিক্রি করিয়া আসে। রোজ দেখি, হনুমনের মেয়েটার চোখ দিয়া জল ঝরে,—কাঁচা কয়লার চুল্লি সে রোজ-রোজ ধরাইতে পারিবে না বলিয়া বাপের সঙ্গে বচসা করে।

হনুমন্ একটা নল-বসানো পিতলের কলসি হাতে ঝুলায়, মাটীর বাটিগুলা ঝোলায় পুরিয়া কাঁধে ফেলে, তাহার পর মুঙ্গেরি-নাগরাই পায়ে দিয়া, শহরের একটা বড় রাস্তার ধারে—গাড়ীর

আড্ডার পাশে গিয়া বসে; বস্তির গুজব নাকি সে চা বিক্রি করিয়া দশ-দশ রোপিয়া রোজ কামায়।

ধোঁয়ার মধ্যে দম বন্ধ হইয়া আসে। শহরের পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য আমিও বাহির হইয়া পড়ি।

গাঁদার তিনটা হাঁস ছিল। একটা হাঁস সেদিন চুরি গেছে। গাঁদা তাই আজকাল একটুখানি সতর্ক হইয়া চলে। দুইটি হাঁসের পায়ে-পায়ে দড়ির ছাঁদ্ লাগাইয়া দরজার পাশে একটা খুঁটিতে তাহাদের বাঁধিয়া রাখে। খুঁটিটা ঠিক তাহার দরজার সুমুখেই থাকে বটে, কিন্তু হাঁস দুইটাকে সারাদিন আমার দোরের গোড়ায় মরার মত মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখি।

আর একটু হইলেই সেদিন তাহাদের মাড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম।

পিছন হইতে ডাক শোনা গেল—

'ঠাকুদ্দা!'

বেহারীর গলার আওয়াজ।

আমার বাঁ-পাশের খুপ্‌রিটি দখল করিয়া সে আজ নাকি বহুকাল এখানে বাস করিতেছে। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, বেশ মোটাসোটা গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। প্রথম যেদিন

আমার সঙ্গে দেখা—সে এক গাল হাসিয়া বলিয়াছিল, 'এইখানে আমার জন্ম ঠাকুদ্দা।'

বিশ্বাস করি নাই। ভাবিয়াছিলাম, পাগল।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে আবার হাসিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেয় যে, না, এখানে তাহার জন্ম নয়,—কথাটা সে 'হাসি-রহস্যি' করিয়া বলিয়াছে।

বলে,

'ইস্তক্ এই বস্তির গোঁড়া-পত্তন দাদা-ঠাউর,—আমি তত্‌দিনের। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ওই কেওড়ানী মাগীর তিনটে ছেলে হলো—আমার এই চোখের সাম্‌নে।'

চোখের গর্ব্ব সে করিতে পারে। লাল রঙের দুইটা গোল-গোল চোখ মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলের নীচে হইতে যেন ঠেলিয়া বাহির হইতেছে বলিয়াই মনে হয়।

'পুকুর ছিল, দাদা, পুকুর ছিল। এই যে এই জমি—এই বস্তি—এইখানে একটা 'পেরকাণ্ড' পুকুর। আর ওই যে ওই ধোপানী, আমাদের বাড়ীউলি গো—। দুটি চরণে ওর কুটি-কুটি পেন্নাম—। মাগীর তেখন্ যৈবন-কাল দাদা,—এই পুকুরে 'হিস্‌সো, হিস্‌সো' করে' কাপড় কাচতো। রূপ? মরি, মরি,

চোখের দিষ্টি ঠিক্‌রে পড়তো। আর—এই দুটি হাত দিয়ে বুঝলেন কি না—লুট্‌তো—পয়সা লুট্‌তো।'

হাতের মুঠা শূন্যে তুলিয়া পয়সা লুণ্ঠনের ইঙ্গিতটা দেখাইয়া বেহারী বলিল,

'আর সেই পয়সার জোরে আজ সে পুকুর গেল উড়ে' ওই যে দেখছেন বেটা হর্‌মন্ পাপী—বেটা পুরোনো পাপী—বহু কালের। আর এই যে, এধারে এই জিলিপি-ওয়ালা, ও-বেটার আগে,—ওই শূয়োর-খুপ্‌রিটায় থাক্‌তো এক বেটা দোসাদ। সে বচ্ছর শীতকালে—অসহ্যি শীত মশাই বলেন কি, আগুনের একটা খাপ্‌রা জ্বেলে ঘরের মেজেয় পড়ে পড়ে বেটা চেঁচাতো। বেটার না-ছিল গায়ে একটা জামা—না-ছিল বিছানা। বুঝ্‌লেন? ভেবেছিলুম, বিছানা একটা দোব বেটাকে। বেটার কপালে নাইকো ঘি—ঠক্‌ঠকালে হবে কি! তার আগেই বেটা একদিন অক্কা পেয়ে গেল। হ্যাঁ—এখন থেকে' বলে রাখি, আর-এক-বেটা আদ্দিকালের বুড়ো আছে আপনার ওই ডান-ধারে,—আপনার ওই গাঁদা-কেওড়ানীর ভাসুর হয়। বেটা খক্ খক্ করে কাশে—আর মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। সাবধান করে' দেবেন—কাশ্‌তে কাশ্‌তে কিচ্ছু বলা যায় না মশাই,—বেটা

এম্‌নি বেসামাল্ হয়ে যায়—পট্ করে' কেন্‌দিন বসে' পড়বে আপনার ওই দোর-গোড়াতেই। বুঝ্‌লেন ?'

বেহারীর সঙ্গে আমার প্রথম দিনের পরিচয়েই এত কথা।

তাহার পর আমার সহিত তাহার 'ঠাকুরদাদা' সম্পর্কের ব্যাখ্যা শুনিলাম।

আমি ব্রাহ্মণ,—বেহারী শূদ্র। কাজেই বয়সে ছোট হইলেও আমি তাহার ঠাকুর-দাদা হই। সে কথা আমাকে সে জোর করিয়া বুঝাইয়া দিল।

বেহারী কোথায় কোন্ বাবুর বাড়ী মোটর চালায়। কখনও এইখানেই তাহাকে নিজে রাঁধিয়া খাইতে দেখি, কখনও বলে সে হোটেলে খাইতে স্থরু করিয়াছে।—'যার যা কাজ তাকেই সাজে; হাতা-বেড়ি-খুন্তি, সে সব চুড়ি-পরা হাতের জন্যে। আর আমাদের এই হাত—'

হাতের তালু দুইটি দেখাইয়া বলে,—

'এই কড়া-পড়া হাতে শুধু—'ষ্টিরিং-হুল্' (Staring-wheel).—মোটর ? আমার মত কে চালায় এই কলকেতা

শহরে? কই, বলুন? পাশ-বুকে একটা খুন-জখমের 'রেপোর্ট্' কই দেখান দেখি?'

ডাক শুনিয়া সেদিন তাহার খুপ্‌রিতে গিয়া দেখি, বেহারী তখন সবেমাত্র শয্যা ত্যাগ করিতেছে,—মাথার চুল উস্কো খুস্কো, মুখখানি শুক্‌নো।

ধরা ধরা গলায় বেহারী কহিল, 'আসুন ঠাকুরদাদা, কাল রাত্তিরেই ভাবলুম ডাকি, কিন্তু একটুখানি 'ডিরিঙ্ক্' করা গেছ্‌ল দাদা, সাহস হলো না। বসুন—অনেক কথা আছে, বসুন ওই মাদুরের ওপর চেপে' বসুন্।'

বেহারী বলিতে লাগিল, 'সেই যে পেরেস্‌টন্ সায়েবের মোটর চালায়, সেই যে কালু বলে' একটি ছোক্‌রার কথা বলেছিলুম সেদিন,—আমতায় বাড়ী,—সেই তারই পিসতুত বোন্, দেখে' এলুম, মন্দ নয়, চলন্‌সই, বেশ ডাগর-ডোগর গড়ন, মন্দ হবে না,—সব ঠিক করেই এলুম ঠাকুদ্দা, আপনাকে যেতে হবে। বিয়ের দিনটা হলো গিয়ে তেইশে,—এই মাসেরই তেইশে। ওরা বলছিল আটাশে হোক্, আমি বল্‌লুম না, আটাশে মঙ্গলবার আমার জন্মবার, তার চেয়ে তেইশেই ভাল। কি বলেন? ঠিক হয়নি? জন্মবারে বিয়ে করাটা ঠিক নয়।'

এই বলিয়া জবাবের জন্য একটুখানি থামিয়া বেহারী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দেওয়ালের গায়ে পেরেকে-টাঙানো তাহার জামার পকেট হইতে ভাঁজ-করা একখানি পোষ্টকার্ড আমার হাতে দিয়া বলিল, 'এই চিঠিখানি আমাকে লিখে দিতে হবে দা'ঠাউর্, নিজের বের নেওস্তন্নের চিঠি—ও সব নিজের হাতে লিখতে কেমন যেন বাদো-বাদো ঠেকে।......ঠিকানা হচ্ছে গিয়ে—রজনীবাবুর কাষ্টো গুদাম, আর্মেনিয়া ইষ্টিরিট্ বিশ লম্বর—শম্ভূনাথ দাস সূত্রধরের নিকটে পৌঁছে।..... শাড়ী একখানা কিন্তে হলো দাদা, দেখাই আপনাকে,—ঠক্লুম্ না জিত্লুম্ কে জানে। তা খরচটি নেহাৎ কম হবে না ঠাকুরদাদা, কি বলেন? হেণ্ডো-নোট্ লিখে' একশ'টি টাকা কর্জ্জ নিতে হলো।'

পোষ্টকার্ডখানা আমার হাতেই ছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কালি কলম আছে তোমার ঘরে? লিখব কিসে?'

'আজ্ঞে না, কালি কলম ত' দাদাঠাকুর,—তবে একটা খাটো-মতন রুড্-পেন্‌সিল না কি একটা সেদিন দেখছিলুম এইখানে—এই বাক্সটার নীচে...'

বেহারী এদিক্-ওদিক্ হাতড়াইতে লাগিল।

'আবার ওঠালে দেখ্ছি।'

দোয়াত-কলম আনিয়া বলিলাম,—

'বল এবার কি লিখতে হবে বল?'

'বলেই যদি দেবো তবে আর নিজে লিখবার কি দোষ ছিল ঠাকুর-দা।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শ্বশুরের নাম কি?'

'শ্বশুরের নাম—?'

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু, সেটি ত' জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'বৌএর নাম?'

বেহারী হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'শস্তোকে অত-সব লিখ্তে হয় না ঠাকুরদা,—লিখে দিন—তেইশে আমার বে হবে, তিনটের সময় ট্রেণে চড়তে হবে গিয়ে,—বুঝ্লেন? তুই আসবি। অতি অবশ্যি-অবশ্যি আসিস্ যেন। বাস্... আসে-আসে না-আসে না-আসে। ··বৌএর নামটি? আহা হা হা হা, দাঁড়ান, দাঁড়ান......'

বেহারী চোখ বুজিয়া বৌএর নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

তেইশে তারিখেই বেহারীর বিবাহ হইয়া গেল। আমি কিন্তু যাইতে পারিলাম না।

ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রকম বেহারী, মঙ্গল ত?'

'আর দাদা! দিয়ে এলুম কোনো রকমে সেরে! আপনার দেহি ভাল আছে?'

সন্ধ্যার পরেই বস্তিটা আমাদের অন্ধকারে থম্ থম্ করে। কেরোসিন পোড়াইয়া রাত্রি জাগিবার প্রয়োজন বিশেষ কাহারও হয় না।

বস্তির এই অন্ধকার উঠানের উপর হঠাৎ সেদিন বেহারীর সঙ্গে আমার মুখোমুখি হইয়া গেল। প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, বেহারীই সর্ব্বপ্রথমে একটুখানি থতমত খাইয়া জবাব দিল।

'চাঁপাকে ডাকছিলুম,—বলি, মাছ রাঁধা আছে ওবেলা থেকে খানিকটা—নিয়ে যা।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'চাঁপা কে?'

একটুখানি চাপা-গলায় বেহারী আস্তে-আস্তে কহিল, 'জানেন না? ওই যে আপনার পাশের ঘরে থাকে—গাঁদার বোন! বেঁটে-সেটে সেই আঁট্-সাট্ মেয়েটি—উ-ই বাবুদের বাড়ী চাক্‌রী করে।'

বেহারী চলিয়া গেল।

সেদিন নৈহাটি যাইব বলিয়া বাহির হইতেছি, বেহারী আমার দরজায় আসিয়া ডাকিল, 'ঠাকুরদাদা!'

খবর কি জিজ্ঞাসা করিলাম।

হাসিতে হাসিতে পকেট হইতে একখানা খামের চিঠি বাহির করিয়া বেহারী আমার হাতে দিল, বলিল, 'পড়ুন। মেয়ে-মানুষের হাতের লেখা, আখরগুলো সব ওঠাতে পারলুম না ঠিক্।'

দেখিলাম, না উঠাইবার মত অক্ষর চিঠিতে একটিও নাই। বেশ ধরিয়া ধরিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক কথাই লেখা হইয়াছে। বেহারীর বৌএর চিঠি। মনে হইল, কোনও ছোট ছেলেকে দিয়া লেখানো হইয়াছে।

'বেশ, বেশ, এইবার একটি জবাব লিখে দাও।'

চিঠিখানি তাহার হাতেই ফিরাইয়া দিতে গেলাম। বেহারী বলিল, 'আমার কি আর সময় আছে ঠাকুরদা, আপনাকেই লিখতে হবে। রাখুন, চিঠিখানি আপনার কাছেই রেখে' দিন।'

বলিলাম, 'আমারও সময় নেই বেহারী, নৈহাটি যাচ্ছি— ফিরতে দেরি হবে।'

'তা হোক্। ফিরে' এসেই লিখে দেবেন ঠাকুরদা, চিঠিখানি রাখুন।'

ফিরিতে আমার দিন-পনর দেরি হইয়া গেল।

সন্ধ্যায় সেদিন বেহারী আমার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।

'দণ্ডবৎ ঠাকুরদা! আপনার দেহি ভাল ত?'

বলিলাম, 'বসো।'

বেহারী বসিল না। পকেট হাতড়াইয়া দু'খানি চিঠি বাহির করিয়া বলিল, 'আবার দুখানা এসেছে ঠাকুরদা! আমি লিখেছিলুম দু'খানা চিঠি,—কিন্তু ঠিকানাটা বোধ হয় গোলমাল হয়ে গেছ্‌ল না কি কিছুই বুঝ্‌লুম না। দেখুন ত' পড়ে'!'

বার-বার এমন করিয়া তাহার স্ত্রীর চিঠি পড়িতে একটুখানি বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। বেহারী বলিল, 'পড়ুন না, পড়েই ফেলুন না দাদা-ঠাউর, নিজে ত একবার পড়েইছি, তাহ'লেও আপনার মুখে একবার শুনি।'

দেখিলাম, একখানি চিঠি তাহার স্ত্রীর, অপরখানি লিখিয়াছে বেহারীর সেই কাষ্ঠো-গুদামের বন্ধু শম্ভুনাথ দাস সূত্রধর। লিখিয়াছে, কুড়ি টাকার হ্যাণ্ড-নোট তোমার

তামাদী হইয়া যাইতেছে। আমি আর রাখিতে পারিব না। এইবার নালিশ করিব।

বেহারীর ডাগর চোখ দুইটা হঠাৎ আরও বড় হইয়া গেল। বলিল, 'কোন্ চিঠিটা,—কোন্‌টা ওর ? এইটা না এইটে ?'

শম্ভুর চিঠিখানি তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম।

বেহারী তৎক্ষণাৎ চিঠিখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'করুক, শালা নালিশই করুক আমার নামে। কই, পড়ুন ত, আর-একখানা, কি লিখ্‌ছে শুনি।'

হস্তাক্ষর বিভিন্ন হইলেও চিঠিখানি বেহারীর স্ত্রী লিখিয়াছে। 'পানের সর' 'হিদয়েশ্বর' এমনি-সব নানান্ সম্বোধনের পর যে-কথাগুলি লেখা হইয়াছে মনে-মনে পড়িতেও লজ্জাবোধ হইতেছিল। বেহারী কিন্তু জোরে না পড়াইয়া ছাড়িল না। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'লিখে দিন, জবাব লিখে' দিন একখানি—বেশ ভাল করে'।'

বিপদে পড়িলাম। বলিলাম, 'আমি আর এর জবাব কি লিখে দেব বেহারী, তার চেয়ে তুমিই লিখো—ভাল হবে।'

বেহারী হাসিতে লাগিল।

'আমার কি আর লিখবার ফুরসুৎ আছে ঠাকুরদাদা, তবে আর বলছি কেন আপনাকে ?'

না লেখাইয়া সে ক্ষান্ত হইল না। বলিল, 'পড়ুন—শুনি।'

শুনিয়া মনে হইল লেখাটা তাহার পছন্দ হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'বিয়ে হয়েছে ঠাকুরদাদার?'

বলিলাম, 'কেন?'

বেহারী আমার মুখের উপর তাহার কদাকার দন্তপাটি বিকসিত করিয়া হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল, তাহার পর হাসি থামাইয়া কহিল, 'পানেশ্বরী কথাটি ত' কই লিখলেন না ঠাকুরদা, হেঁহেঁ—ভুল ধরেছি কিনা, হেঁহেঁ—বলুন?'

তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহাই লিখিয়া দিলাম।

বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার নামটি কি লিখলেন, পড়ুন ত' ঠাকুরদাদা!'

'তোমার নাম লিখে' দিলাম বিহারীলাল দাস।'

ঘাড় নাড়িয়া বেহারী বলিল, 'উঁহুঁ, দাস নয়, রায় লিখুন। দাসটি কেটে' দিন দাদা!'

দিনকতক পরে আর-এক সন্ধ্যায় বেহারী আমার ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

চুপি-চুপি বলিল, 'ঠাকুরদাদা শুনুন্। ওকে ত' আমি

কোনও বদ-মতলবে ডাকিনি ঠাকুরদা! ডাকলুম,—বলি, বাসি মাছ-তরকারি আছে—নিয়ে যা। দুদিন এসে'-এসে' নিয়ে গেল। আজ আবার বলে কিনা,—তুমি এইখানে দিয়ে যাও। কেন? আমি কি বেটীর চাকর? ডেকে-ডেকে দিচ্ছি এই খুব, তা না! আজকে আবার আঁচল ফর্‌কে' চলে যাওয়া হলো! শুনুন দাদাঠাকুর!—ওর ওই দিদি-টিদি, ভাই-টাইগুলো আসবে এক্ষুনি, গোলমাল যদি বেশী-কিছু করে দাদাঠাকুর,—আপনাকে আমি সাক্ষী মানব কিন্তু, এই আমি বলে' রাখ্‌ছি—।'

বলিলাম, 'আমাকে আর ও-সবে জড়িয়ো না বেহারী, এখান থেকে তাহ'লে আমায় উঠ্‌তে হবে দেখ্‌ছি—'

বেহারী বলিল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আপনাকে না হয়,—আর কী এমন...অমন চাঁপা আমি ঢের দেখেছি...এই দেখুন দাদা...হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে যাচ্ছিলুম, আজ আবার ফের আর-একটা।'

পকেট হইতে বেহারী একখানি চিঠি বাহির করিল।

বৌএর চিঠির জবাব আসিয়াছে। হস্তাক্ষর এবার আর-একজনের। মনে হইল চিঠিখানি কোনও মেয়ের লেখা। অনেক করিয়া বেহারীকে সে যাইতে লিখিয়াছে।

বলিলাম, 'যাও বেহারী, তুমি একবার শ্বশুরবাড়ী যাও। অনেক করে যেতে লিখেছে।'

'লিখেছে তা জানি!'

বেহারী উঠিল। অন্ধকার বস্তির উঠানের এদিক-ওদিক্ তাকাইয়া পুনরায় সে ফিরিয়া আসিল।

'—যাবে। যাবে কার কাছে শুনি? জোচ্চোর পাজি শালারা! ভালমানুষ পেয়ে সবাই ঠকায়। লজ্জায় এতদিন বল্‌তে পারিনি দা' ঠাকুর!'

বেহারী একটু থামিল।

'দেখে' এলুম দিব্যি সোমত্ত মেয়ে—দিব্যি জোয়ান! দুদিনের জ্বরে একেবারে কাঠাম্-সুদ্দু বদ্‌লে গেল? আমি কি ঘাস খাই?'

বেহারী চলিয়া গেল।

দরজায় তাহার তালা বন্ধ করিবার শব্দ পাইলাম।

'—চিঠির জবাবটা কাল আমার চাইই ঠাকুরদা—!'

নবম পরিচ্ছেদ

টোটা তাহার ডাক নাম। ভাল নাম না-ই বা বলিলাম। বয়স বেশি নয়, বারো কি তের, দেখিতেও সুন্দর, কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি তাহার হাড়ে হাড়ে। জনপ্রবাদ নাকি এমন ছেলে সচরাচর মেলা ভার।

পাশের বাড়ী জামাই আসিয়াছে,—টোটা দিবারাত্রি সেইখানে। তাহার সমবয়সী মেয়েগুলা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়; জামাইকে নানাপ্রকারে অপদস্থ করিবার নিত্য নব নব কৌশল উদ্ভাবন করিতে একমাত্র সেই ওস্তাদ।

একটা খেজুর গাছের তলায় দাঁড়াইয়া টোটা ঢিল ছুঁড়িয়া খেজুর পাড়িতেছিল, একদল মেয়ে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বসিল, চল্ টোটা, জামাই দেখে আসি।

হাতের ঢিলটা সে তখন সবেমাত্র ছুঁড়িতে উদ্যত হইয়াছে, সেকথার কোনও জবাব না দিয়া বলিল, সরে যা, পালা,—পালা বল্‌ছি টেবি, মাথায় লেগে গেলে আমি জানি না কিন্তু—বলিয়াই ঢিলটা সে উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। টেবি সরিয়া দাঁড়াইল।

সেতী বলিল, আয় না ভাই টোটা, আয় শীগ্‌গির আয়, আর পাড়তে হবে না।

খেজুরগুলা কুড়াইতে কুড়াইতে টোটা বলিল, জামাই ঠকাতেও জানিস্‌নে? তোরা এক একটি আস্ত বোকার ডিম। তোদের কারও বিয়ে হবে না।—যাঃ, অমন সুন্দর পাকা খেজুরটা পড়ে গেল গুয়ের উপর। নে টেবি তুই এইটে কুড়িয়ে খা।

টেবি মুখ বিকৃত করিয়া হাসিল।

সেতী বলিল, হুঁ! বিয়ে হবে না! এই যে এর হয়েছে,—এই যে খেঁদির, এই যে বরুণীর—

টোটা হাসিতে হাসিতে তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, বরুণীর বরের নাকটা কেমন ভাই? এমনি—বলিয়া টোটা তাহার নিজের নাকের ডগায় হাত দিয়া তাহাই দেখাইয়া দিল।

লজ্জায় বরুণী তখন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

টোটা বলিল, নয় বরুণী,—সত্যি বল্‌?

বরুণী রাগিয়া বলিল, তাই বলে' ত' কেউ কারো বাঁশীর মত নাকটা কেড়ে' নিতে যায় নি!—আয় লো আয় সেতী, আয়, ও যাবে না।

সেন্তী জিজ্ঞাসা করিল, যাবি নে টোটা? তবে কি কর্‌তে হবে বল্‌।

টোটার একটুখানি কাছে সরিয়া গিয়া খেঁদি বলিল, সেই ভাই সেই সেদিন কেমন, পানের ডিবের ভেতর আরস্থলা—বলিয়া সে ফিক্‌ ফিক্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল। ইচ্ছা, তাহার বরের সম্বন্ধে টোটা কিছু বলে। বর তাহার দেখিতে ভারি সুন্দর।

টোটা বলিল, খানিক্‌টা গোবর নিয়ে আজ ওর জুতোর ভেতর ঢুকিয়ে দিগে যা,—জান্‌তে পারবে না।

খেঁদি তেম্‌নি হাসিতে হাসিতে বলিল, পা দেবে আর প্যাচ্‌—

খুসী হইয়া তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সকলে চলিয়া যাইতেছিল, খেঁদি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আর, আর একটা?

একটা খেজুর মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে টোটা তাহার মাথার উপর সজোরে একটা চড় মারিয়া বলিল, আর তোর মাথা!

খেঁদি ছুটিয়া পলায়ন করিল।

কিন্তু টোটা সেদিন তাহাদের সঙ্গে না যাওয়ার জন্যই হউক,

কিম্বা সেই ছোট মেয়েগুলার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই হউক্, জামাইএর জুতায় গোবর পুরিতে গিয়া সেদিন তাহারা হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গেল।

বরুণী বলিয়া দিল, তাহারা কিছুই জানে না, যত দোষ টোটার। সেই তাহাদের প্রতিদিন শিখাইয়া দেয়।

কথাটা অতিরঞ্জিত হইয়া টোটার বাবার কানে গিয়া পৌঁছিল। সে বড় শক্ত লোক, কিন্তু শক্ত হইলে কি হয়, মারিয়া মারিয়া ছেলেটাকেও সে শক্ত করিয়া তুলিতেছিল, আর কিছুই করিতে পারে নাই। টোটা সেদিন তাহার এই দুষ্কর্ম্মের জন্য পিতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল না, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিলে সে যৎপরোনাস্তি মার খাইল। মার খাইয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন বৈকালে টোটা নিজেই সেই জামাইবাবুর কাছে গিয়া হাজির। ছোট-ছোট কয়েকটা মেয়ে তাহাকে বিরক্ত করিতেছিল। চড়াইয়া চাপ্ড়াইয়া ভয় দেখাইয়া টোটা প্রথমেই তাহাদের সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল।

জামাইবাবু জিজ্ঞাসা করিল, টোটা, কাল তুমি আমার জুতোর ভেতর গোবর দিয়েছিলে?

টোটা নিতান্ত ভালমানুষের মত বলিল, না জামাইবাবু,

কখ্‌খনো না।—এম্‌নি ভাব দেখাইল যেন সে ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানে না।

একটুখানি থামিয়া টোটা বলিল, ওরা ভারি বজ্জাত জামাইবাবু, খালি-খালি আমায় গিয়ে বলে, চল্‌ ভাই টোটা, জামাই ঠকাতে যাবি না,—চল্‌ ভাই লক্ষ্মীটি! আমি বলি যাব না, ওরা খালি টেনে টেনে নিয়ে আসে। আর ওই যে খেঁদি—হেই এম্‌নি-পারা মুখ, ওই কুঁইলি পেঁচি হারামজাদি ভারি বজ্জাত। একটা বলে' দিলে হয় না, বলে আর-একটা আর-একটা বল্‌, আর কেমন করে ঠকাতে হবে বলে দে।

জামাইবাবু বলিল,—তুমি নিজে না থাক্‌লেও কাল তোমার ও-বুদ্ধিটি শিখিয়ে দেওয়া সত্যি, না? কি বল টোটা?

টোটা জামাইবাবুর কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া হাসিয়া ফেলিল। এবং পরক্ষণেই জামাইএর একখানি হাত ধরিয়া নিতান্ত অনুনয়ের সুরে বলিল, চলুন জামাই বাবু বেড়াতে যাবেন না? চলুন না ওই বনের দিকে।

জামাইবাবু বলিল, না তুমি ভাই দুষ্টু, তোমার সঙ্গে গেলেই বিপদে পড়তে হয়।

চট্‌ করিয়া টোটা বলিয়া উঠিল, মাইরি বল্‌ছি জামাইবাবু আপনার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি কাল থেকে আমি আর কিছু করি না,

আমি খুব ভাল ছেলে হয়ে গেছি। বাবাঃ! যে মার খেয়েছি কাল্‌কে! না, চলুন জামাইবাবু, দেখ্‌বেন আপনি, আজ আমি কিছু করি কি-না! করি ত'——বলিয়া সে কি-একটা শপথ করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলিল, কিছু না করি যদি, আজ আমায় একটি পয়সা দিবেন ত? সেই দিনের মত?

হাঁ দেব—বলিয়া জামাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইল।

গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটা শালের বন। বৎসরান্তের এই সময়টিতে ছোট-বড় শালের গাছে চিকন্ কচি পাতা গজায়, —ফুলের গন্ধে বনপ্রান্ত আমোদিত হইয়া থাকে, মাঝে-মাঝে সাঁওতালের বস্তি। জামাইবাবু কলিকাতা অঞ্চলের সহুরে মানুষ তাহার উপর সামান্য কি একটা চাকৃরি করিয়া দিন চলে, কাজেই তাহার সেই ইঁট-পাথরের বেড়াজালে—বদ্ধজীবনে প্রকৃতির এই অবাধ-মুক্ত শোভা সৌন্দর্য্য দেখিবার অবসর বড় একটা থাকে না। দুদিন বাদেই তাহাকে আবার চলিয়া যাইতে হইবে। তাই সেই মক্ষিকা-গুঞ্জন-মুখরিত তৃণ-পুষ্প-সুরভিত অনতিপ্রশস্ত বনপথটি আর একবার দেখিবার জন্য মন তাহার অজান্তে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, শুধু সেই কারণেই টোটাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সে আর কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিল না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেখান হইতে তাহারা বাড়ী ফিরিতেছিল।

বড় একটা দীঘির পাড়ের উপর দিয়া গ্রামে ঢুকিবার পথ। মেয়েরা কলসী লইয়া ঘাটে জল লইতে আসিয়াছে, একদল সারি বাঁধিয়া এইমাত্র চলিয়া গেল, আর একদল ঘাট হইতে উঠিতেছে। সেই পথ দিয়াই তাহাদের যাইতে হইবে।

জামাইবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; বলিল, টোটা, অন্য কোনদিকে যাবার পথ নেই?

টোটা আগে-আগে চলিতেছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, ধেৎ। আসুন না আমার সঙ্গে,—দিব্যি পাশ কেটে বেরিয়ে যাব আমরা।

জামাইবাবু নতমুখে টোটার পিছন ধরিয়া চলিতে লাগিল।

কিন্তু মেয়েদের ঠিক পিছনে আসিয়া টোটা যে কাণ্ডটা করিয়া বসিল,—এমন যে করিবে জামাইবাবু স্বপ্নেও তাহা ভাবিতে পারে নাই।

সকলের পশ্চাতে যাইতেছিল ঘোষালদের মেজ-বৌ, দেখিতে খুব সুন্দরী, বয়স আঠারো উনিশের বেশি নয়। টোটা তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া বাঁ হাতটি নিজের বুকের উপর রাখিয়া ডান হাত দিয়া ঘোষালদের বৌএর পিঠের উপর ডুগি-তবলা বাজাইতে শুরু করিয়া দিল,—গুঁক্‌গুঁক্‌-তেরিখিটি-তাক্‌।

ভয়-চকিত বধূটি পিছন ফিরিয়া টোটাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি হোঁচট্ খাইয়া দলের ভিতর ঢুকিয়া গোলমাল বাধাইয়া দিল। টোটা তখন নির্ব্বিঘ্নে তাহার কর্ম্ম সমাধা করিয়া দিয়া জামাইবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেও তখন ভয়ে লজ্জায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

মেয়েরা বেশি কিছু বাড়াবাড়ি করিল না। প্রফুল্ল-বৌ বলিল, আয় টোটা তোর মায়ের কাছে আয় একবার, দেখি তুই কত বড় শয়তান। বলিয়াই তাহারা একটুখানি দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল।

জামাইবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া টোটার মুখের পানে তাকাইয়া তাহাকে তিরস্কার করিবার উদ্যোগ করিতেছিল কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না।

টোটা নিজেই বলিল, মাইরি জামাইবাবু, ও ত' একবার, আজ সারাদিনের মধ্যে এই একবার,—ও হয়ে গেল এম্‌নি, আমি আর থাকৃতে পার্‌লাম না,—আর কখ্‌খনো হয় যদিত' এই—রাম, দুই, সাড়ে-তিন,—বলিয়া সে তাহার দক্ষিণ কর্ণটি নিজের হাতেই বার-কতক্ মর্দ্দন করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল।

জামাইবাবুর মুখ দিয়া এতক্ষণে কথা ফুটিল। বলিল, পাজি! ষ্টুপিড্!

টোটা সবিনয়ে বলিল, নাঃ আর কখ্খনো এসব করব না দেখে নেবেন।—কই জামাইবাবু, দিন্ না একটা পয়সা, আমি আর যাব না আপনার সঙ্গে, এই দিক দিয়ে চলে যাই।

জামাইবাবু বলিল, না, তোমার মত ছেলেকে পয়সা দিতে নেই।

দিন্ না জামাইবাবু!

না।

দিন্ না আপনার কত পয়সা। হুঁ—

ঘাড় নাড়িয়া জামাইবাবু বলিল, না, কিছুতেই না।

দিন্ না একটা—

ফের্!

আর কোনও কথা না বলিয়া টোটা চোঁ করিয়া সোজা খানিকটা দৌড়িয়া গেল। মেয়েরা তখনও সুমুখের পথ ধরিয়া চলিতেছিল। তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া টোটা একবার পিছন্ ফিরিয়া তাকাইল,—জামাইবাবু তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া। তাহার পর, মেয়েদের শুনাইয়া শুনাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া জামাইবাবুর উদ্দেশে বলিতে লাগিল এঃ! আমাকে

শিখিয়ে দিয়ে আবার এতক্ষণে চালাকি!—দ্যাখ গো তোমরা সবাই দ্যাখ একবার, নিজে শিখিয়ে দিয়ে আমায় ও আবার মারতে আস্‌ছে উল্টো।

এই বলিয়া টোটা আর সেখানে দাঁড়াইল না, হন-হন করিয়া দৌড়িয়া গ্রামের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার আব্‌ছা অন্ধকারে দূর হইতে তখন বুঝিতে পারা গেল না জামাইবাধ্‌ কি করিতেছে।

গ্রামের বারোয়ারি-তলায় কয়েকদিন ধরিয়া হরিনাম-সংকীর্ত্তন চলিতেছিল,—কাল শেষ হইবে।

সেরাত্রে টোটার ভাল ঘুম হইল না, পরদিন অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াই হাবা, নারা ও মণ্টু—গ্রামের মধ্যে তাহার বিশ্বস্ত অনুচরকে ডাকিয়া আনিল।

হাবা বলিল বারোয়ারি-তলায় চল্‌ কীর্ত্তন শুনে আসি।

নারা বলিল, লোকে আজ মেলা বাতাসা ছুঁড়বে ভাই,—আজ ধূলোট্‌।

বাতাসার নামে মণ্টুর জিবে জল সরিতেছিল, সে আর কোনও কথা বলিতে পারিল না।

তাহাদের সঙ্গে লইয়া টোটা পথ চলিতেছিল, ফিরিয়া

দাঁড়াইয়া বলিল, সে যখন ছুঁড়বে তখন ছুঁড়বে। চ'না আজ একটা ভারি মজা করা যাবে চল্।

পথের পাশে বিষ্ণু চাটুজ্যের পড়ো বাড়ীটার ভাঙ্গা একটা দেওয়ালের আড়ালে লোহার তুইটা সাবল লুকান ছিল, চুপি চুপি সে তুটা বাহির করিয়া হাবা ও নারার হাতে দিয়া টোটা বলিল, এই নরু স্যাকরার দোরের সাম্‌নে একটা আর ওই বোনোয়ারি লাএকের দরজার পাশে একটা—এই তুটো জায়গায় পথের উপরে বেশ ভাল করে তুটো গর্ত্ত খোঁড়া যাক।

মণ্টু বলিল, একেবারে পথের উপরেই, না ওই এক পাশ-চেপে ?

ঘাড় নাড়িয়া টোটা বলিল, না পথের ঠিক্ মাঝখানে। নে—চট্‌পট্।

মণ্টু ছেলেটার ভয় একটুখানি বেশি। বলিল, আর ভাই কেউ যদি দেখ্‌তে পায় আর বকে ?

নারা বলিল, হ্যাঃ! দেখ্‌তে পেলেই ত ? বলব,—খেলা

হাবা বলিল, বক্‌লেই হলো কিনা! কারও বাবার পথ ?

টোটা বলিল, লাগা, লাগা, জল্‌দি লাগা, নইলে দে আমাকে দে সাবল্‌টা।

নারা তখন খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, বলিল, এই দ্যাখ্-না কত বড় গর্ত্ত খুঁড়ে ফেলছি চটাম্ করে।'

হাবা বলিল, আমার এই গর্ত্তটাতে পড়ে শালা ওই ক্ষুদে তিলি, তাহ'লে ভারি মজা হয়। সেদিন আমাদের সেই ছাগলটার জন্যে পালা কাট্‌ছিলাম ওর ওই সার-ডোবার অশত্থ-গাছটায়, ওর সেই বৌ-শালী ট্যাকৃট্যাক্ করে বেরিয়ে এসে বলে কি-না যা নেমে যা, পালা কাট্‌লে গাছ বাড়বে না আমাদের।

টোটা বলিল, দাঁড়া বাড়াচ্ছি,—গাছটাকে মুড়িয়ে কেটে নিয়ে যেতে হবে একদিন।

দেখিতে দেখিতে দুইটা বেশ বড় বড় গর্ত্ত তৈরী হইল। মণ্টুর উপর ভার ছিল এঁটো শালের পাতা ও সরু-সরু কাটি কুড়াইয়া আনিবার। সমস্তই আসিয়া পৌঁছিলে টোটা নিজের হাতে শাল পাতা কাটি ও তাহার উপর বালি দিয়া গর্ত্ত দুইটি এমন ভাবে বন্ধ করিয়া দিল যে, সেখানে গর্ত্ত আছে বলিয়া সহজে আর-কা'রও টের পাইবার উপায় রহিল না।

তাহার পর তাহারা সকলে মিলিয়া রাস্তার উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভিন্ন গ্রামের একটা লোক সেই পথ দিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ একটা গর্ত্তে পা দিতে যাইতেছিল,

টোটা তাহাকে হাঁ হাঁ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, বলিল, এই দিক দিয়ে সোজা চলে যাও, ওখানে কে খানিকটা গু চাপা দিয়ে রেখেছে।

লোকটা চলিয়া গেলে হাবা বলিল, পড়্‌তো ত' পড়্‌তোই, বারণ কর্‌লি যে?

মুরুব্বির মত ভারিক্কি চালে টোটা বলিল, জানিস্‌নে তুই। ও ভিন্-গাঁয়ের লোক—ওকে ফেলে কি হবে? তার চেয়ে আর একটু পরে দেখ্‌বি মজা। গাঁয়ের লোক সব ধূলো-কাদা মেখে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আসবে দেখিস্ ঠিক্ এই পথ দিয়ে,—বাস্! ধূপ্ ধাপ্ পড়বে আর চেঁচাবে।

এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া আবার বলিল, কিন্তু এই বলে রাখ্‌ছি তোদের, খবরদার কেউ হাসিস্ নে যেন। হেসেছ কি মরেছ।

বেলা প্রায় আটটার সময় কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া গেল,। ধুলোট্ সুরু হইল। গ্রামের ছেলে-বুড়ো ইতর-ভদ্র সকলে মিলিয়া নাচিতে নাচিতে বারোয়ারি তলায় গিয়া জড় হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আধঘণ্টা খানেকের মধ্যেই খোল করতাল এবং অন্যান্য নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের শব্দে সমস্ত গ্রামখানা যেন মুখরিত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যেন কিসের একটা

তীব্র মাদকতায় গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছে! কত রকমের নাচ, কত রকমের গান, কত হাসি, কত আনন্দ! সে এক বিরাট ব্যাপার! শত্রুমিত্র, দলাদলি, জাতিভেদ, সব যেন মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল, মুচি-মেথর, চামার-চণ্ডাল কাদা-মাটি মাখিয়া একসঙ্গে নাচিতে স্থরু করিল।

বৎসরের মধ্যে শুধু এই একটি দিন! তাও আবার কোনও বৎসর অর্থের সঙ্কুলান হয় না। আজিকার দিনে এই প্রাণবন্ত সজীবতাটুকু তাহাদের অর্দ্ধমৃত শুষ্ক দগ্ধ হৃদয় হইতে সহসা কেমন করিয়া যে উৎসারিত হইয়া ওঠে কে জানে! মনে হয় না যে বৎসরের সকল দিবসে, দিবসের সকল প্রহরে ইহারাই আবার উপেক্ষিত পল্লীর ঘরে-ঘরে হিংস্র শ্বাপদের মত চার পায়ে হাঁটিয়া বেড়ায়, নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি মারামারি করিয়া মরে। করুণা হয়,—অন্ধতমসাচ্ছন্ন অধঃপতিত এই বিরাট জনসঙ্ঘ যে কত বড় অসহায় সেই কথাটাই সর্ব্বপ্রথমে মনে হইতে থাকে।

বারোয়ারিতলা হইতে মাদল বাজাইয়া বাগ্‌দিদের প্রথম যে দলটা বাহির হইল তাহারা চলিয়া গেল পশ্চিমপাড়ার দিকে। দরবেশী বাউল গান করিবার জন্য ভিন্নগ্রাম হইতে

একদল নেড়ানেড়ী আসিয়াছিল, আনন্দলহরী বাজাইয়া গান করিতে করিতে দক্ষিণপাড়ার একটা রাস্তায় গিয়া তাহারা ঢুকিল। কয়েকটা দল বারোয়ারিতলার আসর জমাইতে লাগিল, এবং বামুনপাড়ার দলটা আসিল টোটার সেই গর্ত্তখোঁড়া পথের উপর দিয়া।

বিষ্ণু চাটুজ্যের পড়োবাড়ীর দেওয়ালের আড়ালে নিতান্ত গোবেচারির মত টোটা দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গীদের বলিল, যা তোরা নাচ্‌গে যা।

কিন্তু আনন্দের এত আয়োজন, এত কষ্ট করা সত্ত্বেও বিধি বাধ সাধিলেন। হাসিতে গিয়া টোটার মুখের হাসি সহসা বন্ধ হইয়া গেল। প্রথম নম্বরেই গর্ত্তে পা দিয়া খোঁড়া হইল রাধু মল্লিক—টোটার বাবা। সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের মধ্যে একটা হৈ চৈ গোলমাল উঠিল। দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় গর্ত্তে পড়িয়া পেতাপ্‌ বাগ্‌দির ডান্‌-পাটা মুচ্‌কাইয়া গেল। তাহার পর কাহার যে কি হইল গোলমালে আর-কিছুই ঠিক-ঠাহর পাওয়া গেল না। টোটা তখন সকলের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেছে।

টোটা যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, পল্লীপথে দুপহরের রৌদ্র তখন ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। গত কয়েক দিন ধরিয়া বারোয়ারি

তলায় যে সমারোহ চলিতেছিল, উৎসব-শেষে আজ আর তাহার কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। পূর্ব্বের মত সমস্ত গ্রামখানা ইহারই মধ্যে আবার নিঝ্‌ঝুম হইয়া গেল। পেতাপ্‌ বাগ্‌দির পায়ের অবস্থা কিরূপ আছে দেখিবার জন্য টোটা একবার তাহার বাড়ীর দিকে গিয়াছিল কিন্তু তাহার দেখা পাওয়া যায় নাই। রাজার কাছারীতে কি একটা কাজের বেকার দিবার জন্য নায়েবের পেয়াদা আসিয়া সমস্ত বাগ্‌দিপাড়ার লোকগুলাকে মার-ধোর করিয়া ডাকিয়া লইয়া গেছে।

বারোয়ারিতলার সুমুখে টোটা একবার থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল লোকজন কেহ কোথাও নাই,—গেঁয়ো দুইটা কঙ্কালসার কুকুর ভোগ-মন্দিরের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। লাট-শালার পরেই সারি-সারি তিনটি মন্দির—একটি মনসার, দুইটি শিবের। কিন্তু মন্দিরের চত্বর দুপুরের রৌদ্রে এত বেশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, সেখানে পা দিয়া দাঁড়ানো চলে না। টোটা সেই তপ্ত শানের উপর দিয়া মনসা-মন্দিরের চৌকাঠের সমুখে গিয়া দাঁড়াইল। আর-একবার এদিক-ওদিক্‌ তাকাইল; দেখিল, পথে তখনও জনমানব নাই। ধীরে ধীরে সেইখানে সে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, মনসা-মন্দিরের চৌকাঠে মাথাটা ঠেকাইয়া মনে-মনে কি

যেন কামনাও করিল, তাহার পর সেখান হইতে উঠিয়া সে আবার পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। পথের গর্ত্ত দুইটা তখনও তেম্‌নি রহিয়াছে। টোটা আবার থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তপ্ত বালির উত্তাপে পা তখন পুড়িয়া যাইতেছে। কয়েক্‌টা ইট্‌-পাট্‌কেল আনিয়া তাড়াতাড়ি সে গর্ত্ত দুইটা নিজের হাতে আবার বন্ধ করিয়া দিল।

ঘরের কাছাকাছি আসিয়াও টোটা বাড়ী ঢুকিতে পারিতে-ছিল না, দরজার পাশে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতে লাগিল। সেখান হইতে যদিও কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না, তবু তাহার মায়ের তীব্র কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনিয়া ইহা তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ভিতরে একটা গণ্ডগোল নিশ্চয়ই বাধিয়াছে। বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া স্বরু হইয়াছে ;—এবং ইহা তাহাদের চিরাভ্যস্ত অভ্যাস,—প্রতিদিনের মধ্যে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের জন্য না হইলেই নয়।

মা বলিতেছে, চাল ডাল নুন তেল কিছু নেই বাড়ীতে, আর বাবু এলেন এতক্ষণে নেচে পা ভাঙিয়ে।

বাপ্‌ বলিল, আঃ! তাতে আর হয়েছে কি? এনে' ত' দিলাম এই ভাঙা পা নিয়েই!

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়াই সে আবার বলিল, বছরের-সাধ একটা দিন নাচ্‌তে যাব না—স্ফূর্ত্তি কর্‌তে ?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব আসিল, না। যার ঘরে নাই ভাত, তার অত সখ কিসের ? কাজ-কি নাচা-নাচিতে ?

তাই বেশ বাপু বেশ, আর যাব না।

ঝগড়া এইবার আর অগ্রসর হয় না দেখিয়া টোটার মা কাঁদিয়া ফেলিল।—বাবারে বাবা! আমার হয়েছে মরণ-মুস্কিল! শেষে জ্বলে, পুড়ে' মর্‌তে যে হয় আমাকেই।

হ্যাঃ! উনি-ই যেন মর্‌ছেন জ্বলে-পুড়ে' ? আর-কেউ মরে না ?

টোটার মা বলিল, তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। এম্‌নি কোন্‌দিন দেবে আর-কি ভাসিয়ে সবাইকে,—আমার হাড়ে হলুদ দিয়ে যাবে হয়ত কোন্‌দিন মরে'—বাস্‌!

স্ত্রীর মুখে নিজের মরণের কথা শুনিয়া রাধু মল্লিক একটুখানি রাগিয়া উঠিল। বলিল, আমার মরণ তাকিয়ে তুই ত' মাছ-পোড়া হাতে নিয়ে বসে আছিস্‌। তা কি-আর আমি জানি না ?

রান্নাঘর হইতে আবার কান্নার স্বরে জবাব আসিল,—দেখ,

ওই-সব কথাগুলো বোলো না বল্‌ছি। দেব আখুনি মাথা খুঁড়ে আধ-সের রক্ত বের করে' তোমার পায়ে।

রাধু বলিল, না, আমার পা অত সস্তা নয়।

নাও, হাসি-ঠাট্টা রাখ। খুব হয়েছে—মরদ!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া রাধু বলিল, পায়ে চুণ-হলুদ লাগাব বলে' এতক্ষণ ধরে বসে আছি,—কই দিলিনে যে?

আমি পার্‌ব না। বলিয়া স্পষ্ট জবাব দিয়া সে আবার কহিল, নিজেই বা নিলে! কেন, কুঠে ত' নও!

রাধু মল্লিক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উঠিল। এবং নিজেই খানিক্‌টা চুণ ও হলুদ আনিয়া মাটির একটা পাত্রের উপর উনানের একপাশে গরম করিতে দিল।

চুণ-হলুদ গরম হইতে দেরি হইল না। কিন্তু উত্তপ্ত সেই মাটির পাত্রটা উনান হইতে তুলিতে গিয়া হাতে তাহার হঠাৎ ছ্যাকা লাগিয়া গেল। একে ত' নাচিয়া গাহিয়া খোঁড়া হইয়া ক্লান্ত সে হইয়াই ছিল, তাহার উপর এত বেলা পর্য্যন্ত না খাইয়া কলহ-কিচ্‌কিচি করিয়া মনটাও তাহার ভাল ছিল না,—হাতে আগুনের আঁচ লাগিতেই সর্ব্বাঙ্গ তাহার জ্বলিয়া গেল। টোটার মা তখন তাহার কাছে বসিয়াই রান্না করিতেছিল। তাড়াতাড়ি চুণ-হলুদ-সমেত গরম খোলাটা রাগের চোটে রাধু

মরি-বাঁচি করিয়া হাতে তুলিয়া লইল এবং সেটাকে সে একটুখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর পায়ের উপর তাহা ফুটাইয়া দিয়া সরোষে চীৎকার করিয়া উঠিল, তবে নে শালী এই রইলো এইখানে। হারাম-জা-দী—ইহার বেশি রাগে তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না,—আবার তেম্‌নি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে বাহিরে চলিয়া গেল।

দরজার বাহিরে তাহাদের আস্তাকুঁড়ের পাশে টৌটা এতক্ষণ আধ-উড়ন্ত একটা শালিক পাখীকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল,—ঘরের ভিতরের কোলাহল কতকটা স্থম্‌সান্‌ হইয়াছে দেখিয়া শালিক পাখীর আশা সম্প্রতি সে পরিত্যাগ করিয়া ঘরে ঢুকিল। বাবা তখন স্থমুখ হইতে সরিয়া গেছে, সরাসর সে তাহার মায়ের কাছে গিয়া বলিল, দে ভাত দে,—ক্ষিদে পেয়েছে।

পায়ের উপর গরম চূণ-হল্‌দি পড়িয়া ফোস্কা না উঠিলেও জ্বালা করিতেছিল। বলিল, ভাত নেই আজ, যা পালা সব আমার স্থমুখ থেকে।

ব্যাপার যে কতদূর গড়াইয়াছে টৌটা তাহার কিছুই জানিত না, বলিল, বাঃ সকাল থেকে কিছু খেয়েছি? ক্ষিদে পায়নি আমার?

টোটার মা বলিল, সে তোর বাপকে ডাক্—রাঁধুক্ বাড়ুক্ খা'ক্ খাওয়াক্—আমি কিছু জানিনে।

এই বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া সে অন্যত্র চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, টোটা তাহার আঁচল ধরিয়া বলিল, দিয়ে যা ভাত! ক্ষিদে পায়নি?

কথার কোনও জবাব না দিয়া আঁচলটা টানিয়া লইয়া তাহার মা চলিয়া গেল। টোটা তাহার পিছনে পিছনে চলিতে-চলিতে বলিতে লাগিল, উনোনে ওই যে কি চড়ানো রইলো, ওটা পুড়ে যাক্ তাহ'লে?—মুড়ি কোথায় আছে বল্ আমি নিজেই নিই-গে।

রান্নাঘরের পাশেই ঢেঁকি-শালের কাছে বসিয়া তাহার বাবা যে তামাক সাজিতেছিল টোটা তাহা দেখিতে পায় নাই। রাধু তাহার রাগ ঝাড়িবার আর লোক পাইতেছিল না, টোটাকে দেখিতে পাইবামাত্র সে তাহার কাণে ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাত খাবার জন্যে চেঁচাচ্ছিস্ যে? ভাত হয়েছে জানিস্?

টোটা চুপ করিয়া রহিল।

এতক্ষণ কোথা ছিলি,—ছিলি কোথা হতভাগা? বলিয়া সে তাহার গালের উপর ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া দিল।

টোটা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল, কোনও জবাব দিল না।

রাধু এইবার তাহার পেটের উপর এক লাথি মারিয়া তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, বেরো হারামজাদা বেরো ঘর থেকে। পড়া নেই, শোনা নেই, এতক্ষণে এলেন ওঁকে বিরক্ত করতে!

এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া পুনরায় তাহার কলিকাটা সাজিতে সাজিতে মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিতে লাগিল,—এঁঃ! ভাত খাব—ভাত খাব, পিণ্ডি খেগে, আখার ছাই খেগে যা—

টোটা কাঁদিল না, কিছু বলিল না, মুখ ভার করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণে ঘরের ভিতর হইতে তাহার মা ডাকিল, টোটা, টোটা, যাস্‌নে—

কিন্তু তাহাতে তাহার অভিমান যেন আরও খানিকটা বাড়িল বই কমিল না।

সরাসর গ্রামের পথ ধরিয়া বোধকরি সে তাহার কোনও অনুচরের কাছেই যাইতেছিল।—বারোয়ারি-তলার কাছাকাছি একটা ছেলের সঙ্গে দেখা। নাম—ডেলাই ঠাকুর। ছেলেটা

তাহারই সমবয়সী কি এক-আধ বছরের ছোটই হইবে। 'ঠাকুর' তাহাদের উপাধি—পূজা-পৌরোহিত্য করিয়া দিন চলে। ফুলের একটা সাজি ও একটা গাড়ু হাতে লইয়া সে বারোয়ারি-তলার দিকে যাইতেছিল। মনসা ও শিবের পূজা তাহারাই করে, এবং তাহার জন্য বিঘাকতক দেবোত্তর জমির ফসল তাহারা পায়।

টোটা জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাচ্ছিস্ ডেলো?

পূজো করতে। কেন?

এত দেরি হলো যে?

ডেলাই ঈষৎ হাসিয়া চুপি-চুপি বলিল, পূজো বলে কারুর মনেই ছিল না,—বাবা ঘুমোচ্ছে।

টোটা বলিল, তুই পূজো করতে জানিস্?

হ্যাঁ জানি। বাঃ, কতদিন থেকে করছি!

কই বল্ দেখি মন্তর্।

ডেলাই একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, পেরথমে একবার এই ধর্ গাড়ুর জলে সব চান্-টান্ করিয়ে দিলাম, তারপর গায়ত্তি জপ্‌তে হয় দশবার; বাস্, আবার কি? আতপ চাল, ফুল আর বেলপাতা নিয়ে তিনবার,—শিব হলে, ওং শিবায় নম, ওং শিবায় নম; আর মনসার বেলায়, ওং মা

মনসায় নম, ওং মা মনসায় নম। শেষে উঠে আসবার সময় গাড়ুর জল নিয়ে ওং রিং রিং ফট্—ওং রিং রিং ফট্।

টোটা জিজ্ঞাসা করিল, তুই ভাত খেয়েছিস্ ডেলো?

ডেলাই প্রথমে 'না' বলিতে গিয়াছিল, পরে থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিল, হাঁ। আমি ত জানি না ভাই, যে আমাকেই পূজো করতে হবে।

টোটা কহিল, ভাত খেয়ে পূজো হয়?

ঘাড় নাড়িয়া ডেলাই বলিল, হাঁ, মা বল্‌লে, হয়।

কই দেখি কি আছে তোর সাজিতে? বলিয়া টোটা উঁকি মারিয়া ফুলের সাজিটা দেখিতে যাইতেছিল, ডেলাই বলিল, চান্ করেছিস্ ত টোটা? তা নইলে বাবা হেঁ-হেঁ, জান না ত?

হ্যাঁ করেছি। বলিয়া টোটা দেখিল, সাজির মধ্যে কয়েকটি রক্ত-করবীর ফুল, খান-দশ-বারো বেল-পাতা আর একটি পিতলের ছোট রেকাবের উপর একমুঠা আতপ চাউল ছাড়া আর-কিছুই নাই।

টোটা জিজ্ঞাসা করিল, মনসা ঠাকুরটার পূজো করবি নে? ওই মনসার?

হাঁ, করব।

তবে, হেঁইও! বলিয়া টোটা অতর্কিতে সেই সাজিটার নীচে হাত দিয়া এমনভাবে তাহা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল যে, ফুল, বেলপাতা, রেকাবি ও আতপ চাল পথের ধুলামাটির উপর তৎক্ষণাৎ ছড়াইয়া পড়িল।

ব্যাপার দেখিয়া ছেলেটা প্রথমে অবাক্ হইয়া পথের মাঝে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং পরক্ষণেই ভয়ে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিল, এঁ্যা—এই চল্‌লাম আমি বাবাকে বল্‌তে, শা——লঁা——

আপন্-মনে চলিতে চলিতে টোটা একবার পিছন্ ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, যাঃ যাঃ!

দশম পরিচ্ছেদ

ভূতের কাহিনী

বয়স বৎসর-চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে এই বয়সেই দাঁতগুলি সব পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া সকলেই তাহাকে ফোক্‌লা-হরি বলিয়া ডাকিত। একাধিক্রমে উনিশ বৎসর লোহার কারখানায় কেরাণীগিরি করিয়া, আপিষ-মাষ্টারের লাথি-জুতা খাইয়া তোষামোদি করিয়া তাহার মেজাজটা হইয়া গিয়াছিল অমানুষিক।

যখন-তখন যার-তার নামে নালিশ করিয়া ফোক্‌লা হরি,—একদিকে যেমন সাহেবের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে সহকর্ম্মী বন্ধুগণ তেমনি ঘৃণায় ও ভয়ে তাহার পাশ ঘেঁসিত না। তবে একটা ছোকরা ছিল, যাহাকে বাধ্য হইয়া সর্ব্বক্ষণ তাহার কাছে থাকিতে হইত। সে তাহারই শ্যালক—পরেশ। নিতান্ত নিরীহ গোবেচারী। বয়স সতেরো কি আঠারো, শরীরে অপরিমিত ক্ষমতা, কিন্তু নিরক্ষর। নিরক্ষর হইলেও, পিতৃদত্ত বিঘা চল্লিশেক জমির উৎপন্ন ফসল হইতে তাহার একটা পেট বেশ ভাল করিয়াই চলিতে পারিত, কিন্তু চলুক আর নাই চলুক, একদা হরি-হর বলিল, চল্‌ পরেশ—আমার সঙ্গে কারখানায়

একটা চাকরি করবি চল। এমনভাবে বসে থাকলে আর চলবে না। তুই ত' বিধবা মেয়ে ন'স্ যে ঘরে বসে ভাত মারবি।

দিদির যখন বিবাহ হয়, পরেশ তখন নিতান্ত ছেলে-মানুষ। এবং সেই অবধি হরিহর তাহার উপর অভিভাবকত্ব করিতেছে। কাজেই কথাটার কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া একটা নূতন জীবনের মোহে, নূতন দেশ দেখিবার আশায়, পরেশ তাহার সহিত কারখানায় আসিল।

এত বড় লোহার কারখানা—এত সব কল-কব্জা এত বড় আপিস, এত বাবু এত সাহেব-মেম সে জীবনে কোনদিন দেখে নাই। তাই এ নূতন স্থানে আসিয়া প্রথমে দিনকতক সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই সব দেখিতে লাগিল।

কিন্তু বসিয়া বসিয়া অনর্থক 'মেসের' ভাত ধ্বংস করিয়া এসব দেখাইবার জন্য হরিহর তাহাকে আনে নাই। তিন দিনের পর ঢালাই-খানায় হেড-মিস্ত্রীর নিকট পরেশ চাকরিতে নিযুক্ত হইল। 'ফারনেস্' হইতে অগ্নি-শিখার মত তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের গলিত লৌহ গড়াইয়া আসিত, মিস্ত্রির আদেশ মত কুলি-মজুরেরা বড় বড় কটাহে তাহা ধরিয়া লইয়া ছাঁচে ঢালিয়া দিত। পরেশকে ওই কুলি-মজুরদের সঙ্গে

খাটিতে হইত। কর্ম্মশেষে প্রতিদিন দশ আনা হাজিরা মিলিত।

প্রত্যেকটি কাজ নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া ধীরে-সুস্থিরে করা প্রথমতঃ এই উচ্ছৃঙ্খল পল্লী-যুবকের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে মিস্ত্রি ও সাহেবের মার খাইয়া কাজটা তাহার করায়ত্ত হইয়া উঠিল।

সেদিন শীতের সন্ধ্যা। গায়ে গরম কাপড় জড়াইয়া ফোক্লা হরি কাঁপিতে কাঁপিতে আপিস হইতে 'মেসে' ফিরিয়া দেখিল, পরেশ তালা-বন্ধ দরজার বাহিরে বসিয়া বসিয়া শীতে কাঁপিতেছে। অগ্নিজ্বালাময় কারখানার মধ্যে কাজ করিত বলিয়া দিনের বেলা তাহার গরম কাপড়ের প্রয়োজন হইত না, গায়ে শতচ্ছিন্ন মলিন গেঞ্জি। পরনের কাপড়খানা ততোধিক মলিন। সর্ব্বাঙ্গে কালি মাখা। হাত-পা পরিষ্কার করিবার জন্য কারখানা হইতে যে সাবানের টুকরা টুকু পাইত তাহাও আবার হরিহরের জামা-কাপড় পরিষ্কার করিতেই ফুরাইয়া যাইত। কাজেই শুধু সরকারি কলের জলে পরেশের অঙ্গের মলিনত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

পরেশ এত সকালে চলিয়া আসিয়াছে দেখিয়া হরিহর উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—আজ যে বড় আগেই চলে এসেছিস?

কাল রাতের বেলা খেটেছিলুম।

হরিহর তালা খুলিবার জন্য অগ্রসর হইতেই পরেশ—সসম্ভ্রমে উঠিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। হরিহর বলিল, কাল রেতে খেটেছিলি ত আজ কি বটে শুয়ার। ধীরে ধীরে পরেশ বলিল গাটা কেমন করছে।

মুখ বিকৃতি করিয়া হরিহর কহিল, এঃ বলে কিনা গাটা কেমন করছে। সোনার অঙ্গ তাই কালি হয়ে গেল হতভাগার, দে কত পেয়েছিস, দে। বলিয়া হরিহর হাত পাতিল।

ট্যাক্ হইতে দিনের রোজগার একটি আধুলি বাহির করিয়া হরিহরের হাতে দিয়া পরেশ বলিল, আট আনা।

আধুলিটা পকেটে ফেলিয়া দিয়া ঘরের ভিতর তক্তাপোষের উপর বসিয়া বলিল, নে তামাক সাজ।

পরেশ তামাক সাজিতে বসিলে হরিহর কহিল, ওভার্ টাইমে খাটতে যাবিত, ক'টা বাজল এখন ?

আজ আর যাব না মনে করছি। বলিয়া হুঁকাটা সে তাহার হাতের কাছে ধরিয়া দিল।

হরিহর হুঁকাটা হাতে লইয়া টানিতে টানিতে বলিল, যাবি না।......তবে আজ রেতের খোরাক বন্ধ—খাবি কি, দাঁড়া

ঠাকুরকে বলে দিই—'ঠাকুর!' 'অ ঠাকুর!'

ঠাকুরের সাড়া-শব্দ না পাইয়া হরিহর বলিল, ডাক ঠাকুরকে।

পরেশের আহারের জন্য ঠাকুরের কাছে পেট-ঠিকা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বেলা ছয়টার পর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পরেশ উপ্‌রি খাটিয়া যাহা রোজগার করিত তাহা হইতে মাসে সাতটি করিয়া টাকা ঠাকুর পাইত। তাহার পরিবর্ত্তে ঠিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ভাত ডাল তরকারি পরেশকে দেওয়া হইত, একবারের বেশী চাহিলে পাইবার হুকুম ছিল না। তাহাতে তাহার পেট ভরুক আর নাই ভরুক! এক বেলা না খাইলে ছয়টা পয়সা ফেরত।

ঠাকুর তরকারি কুটিতেছিল। পরেশ বলিল, ডাকছে তোমাকে।

কেন রে—

নিজের আহার বন্ধ করিবার জন্য সে যে নিজেই তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে, এ-কথাটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। পরেশের অশ্রু-ভারাক্রান্ত চোখ-মুখের দিকে নজর পড়িতেই ঠাকুর সমস্তই বুঝিল। বলিল, আজও তাই? তোর ভাবনা নেই পরেশ, আমি খেতে দেব তোকে, চল্:

ঠাকুর উঠিয়া হরিহরের কাছে গিয়া বলিল, কি বল্‌ছেন হরিহর-বাবু ?

হরিহর অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়াছিল—বলিল, না কিছুই বলিনি যাও।

ঠাকুর চলিয়া গেলে পরেশকে ইসারা করিয়া হরিহর বলিল, —শোন্‌।

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত পকেট হইতে তাহারই রোজগারের আধুলিটা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, যা তোকে করিমগঞ্জে যেতে হবে একবার। গাঁজা ফুরিয়ে গেছে, একদম নাই। যা, দৌড়ে যাবি আর আস্‌বি! এই শীতের রাত, না পেলে সর্ব্বনাশ হবে।

করিমগঞ্জ সেখান হইতে দুই ক্রোশের কম নয়—এই প্রচণ্ড শীতের অন্ধকার রাত্রে উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়া একটা শতচ্ছিন্ন গেঞ্জি মাত্র গায়ে দিয়া কেমন করিয়া যাইবে, আর আসিবেই-বা কেমন করিয়া ? কিন্তু সে-ভাবনা ভাবিবার অবসর তাহার ছিল না। বাহিরে বিরাট অন্ধকার তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল। পরেশ ঘরের কোণ হইতে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা তুলিয়া লইতে যাইবে এমন সময় হরিহর চীৎকার করিয়া উঠিল, বাঃ লণ্ঠন নিয়ে যাবি—

আর আমি অন্ধকারে জুজু-বুড়ীর মতন বসে থাক্‌ব বুঝি ? ভূতের আবার জন্ম-মাস ! লণ্ঠনের দরকার নেই, অমনি যা— !

সোজা রাস্তা, যা যা শীগগির যা বাপু—

পরেশ কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যে পরেশ করিমগঞ্জ হইতে ফিরিয়া দেখিল, মেসের বাবুরা সকলে খাইতে বসিয়াছে। একমাত্র হরিহর বাকি। পরেশের আসার প্রতীক্ষায় সে তখন উদ্‌গ্রীব হইয়া সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া বিছানার এক পাশে চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল।

পরেশ ঘরে ঢুকিতেই আগ্রহাতিশয্যে বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পরেশের হাত হইতে গাঁজার পোঁটলাটি লইয়া বলিল, দেখি, বেটারা তোকে আনাড়ি ঠাউরে ফাঁকি দিয়েছে না ঠিক ঠিক ওজন করেছে। বলিয়া হরিহর অত্যন্ত মনযোগের সহিত বস্তুটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কতকটা গাঁজা বাম হস্তে রাখিয়া বাকিটুকু অতি যত্নসহকারে বাক্সবন্দী করিয়া হরিহর বলিল, ত্যাখ্‌ত পরেশ, ওই পুরোনো জুতো-জোড়াটার ভেতর একটা ছোট কোল্‌কে আছে, দে ত' !

পরেশ কলিকাটা আনিয়া তাহার হাতে দিল। গাঁজাটা

কিয়ৎক্ষণ উত্তমরূপে হস্তে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া বলিল, দরজা বন্ধ করে তুই বাইরে দাঁড়া।

দরজা বন্ধ করিয়া পরেশ বাহিরে চলিয়া গেল, হরিহর তাহার উভয় হস্ত একত্র সংযোগ করিয়া সে এক অদ্ভুত কৌশলে ছোট কলিকাটি ধরিয়া প্রাণপণে কয়েক দম টানিয়া পুনরায় কলিকাটি লুকাইয়া রাখিল। ডাকিল, পরেশ! ঠাকুরকে আমার ভাত দিতে বল্‌ত এবার।

কিয়ৎক্ষণ পরে পরেশ আসিয়া জানাইল, ঠাকুর ভাত দিয়েছে আপনি যান।

হরিহরের বেশ নেশা জমিয়াছিল। খড়ম্‌-জোড়াটা পায়ে দিতে দিতে বলিল, হেঁ-হেঁ, বলছি যে বাবা চিরদিনের অভ্যেস—এক টান না টান্‌লে কি আর খিদে পায়!

থালা অভাবে পরেশকে সকলের শেষে খাইতে হইত। হরিহর চলিয়া গেল। অন্ধকার শূন্য ঘরটায় একাকী বসিয়া বসিয়া পরেশ নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল।

পরেশের খাওয়া শেষ হইতে না হইতে হরিহর ডাকিল, পরেশ, অ পরেশ!—ঠাকুর, পরেশটা এখনও করছে কি? তার কি ভাত খাওয়া আজ আর শেষ হবে না নাকি?

এই যে, হয়ে গেছে। বলিয়া পরেশ যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার

সহিত আহারাদি শেষ করিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিল, কি জন্যে ডাকছিলেন ?

হরিহর বলিল, আমি ভুলে গিয়েছিলাম—কাল ত শনিবার ? বাড়ী যেতে হবে, অথচ কাপড়চোপড় গুলো ময়লার একশেষ। কলতলায় বসে' বসে' একটু-খানি পরিষ্কার করে দিতে পারবি না— ?

অপরিষ্কার তিনখানা কাপড় ও খান-দু-এক জামা হাতে লইয়া পরেশ কলতলার দিকে চলিয়া গেল। কেন পারিবে না ? সবাই যখন পারিতেছে তখন একটুখানির জন্য বদনাম কিনিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

পরেশ কলতলায় বসিয়া কাপড়-জামায় সাবান দিতে দিতে দেখিল, মেসের দরজাগুলো একে একে সকলেই বন্ধ করিল। আলো নিবিল। সম্মুখের ঘরে জনকয়েক আফিসের কেরাণী আহারাদির পর হাসি-তামাসা গল্প-গুজব এবং চীৎকার করিতেছিল, তাহারাও চুপ করিয়া একে একে বিছানায় শুইয়া পড়িল। বামুন-ঠাকুর, ঝি, লণ্ঠন হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় ঠাকুর বলিল, সদর দরজাটা বন্ধ করিস পরেশ—আ, তুই-শালারও কপাল! রাত-দুপুরে কাপড় কেচে মরছিস ?

শীতের কন্‌কনে বাতাস সারাগায়ে তীরের মত বিঁধিতেছিল ঠাণ্ডা জলে তাহার হাত দুইটা ক্রমেই যত আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছিল, সে তত বেশী শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রাণপণে খদ্দরের মোটা মোটা কাপড়গুলা কাচিতে আরম্ভ করিল। তাহাকে কষ্ট দিবার জন্যই বুঝি এ কাপড় কেনা হইয়াছে। পরেশ শুনিয়াছিল, সাহেবদের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই নাকি এসব জিনিসের আমদানি হইয়াছে। মোটা খদ্দরের কাপড় পরিয়া তাহাদের যে কিরূপে জব্দ করা যাইবে, সে-সবের ইতিহাস তাহাকে কেহ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয় নাই। না বুঝাক্। সে-সব বড় বড় বাহিরের খবর রাখিতে সে তত বেশী উৎসুক ছিল না; তবে, একথাটা তাহার অনুক্ষণ মনে হইত যে, পৃথিবীতে কি এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে তাহার এই একান্ত হিতৈষী আত্মীয়ের অত্যাচার নিবারণ করিয়া দিতে পারে?

দূরে প্রকাণ্ড চিম্‌নিগুলা হইতে গাঢ় রক্তাভ ধূম নির্গত হইতেছিল। পরেশ একবার আকাশের দিকে চাহিল। মাথার উপরের আকাশটা তারায় তারায় ভরাট হইয়া আছে। আজ যদি সে কারখানায় যাইত তাহা হইলে ভাল হইত। সেখানে জলের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। চারিদিকে শুধু আগুন আর বিদ্যুৎ! আর এখন যাহারা সেখানে কাজ করিতেছে, তাহারা হয় ত

এতক্ষণ আগুনের গরমে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছে—গলিত লৌহের অগ্নি-উত্তাপ ভেদ করিয়া শীত সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। ভাবিল, একদিন সে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া পালাইয়া যাইবে। কোনও দূরদেশে গিয়া বরং সে মাটি কাটিয়া খাইবে সেও ভালো, তবু আর এ নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য করিবে না। এমন হিতৈষী আত্মীয়-স্বজন থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

সোমবার প্রাতে হরিহর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। দেখিল—পরেশ শয্যাগত। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহার রক্ত-আমাশয় হইয়াছে।

হরিহর বলিল, কিছু খাসনে, উপোস দে দিন কতক।

কিন্তু, উপবাস দিয়া সারিয়া যাওয়া দূরে থাক্, রোগটা ক্রমশই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। পাঁচ ছয় দিন পরে হরিহর বলিল, যা তুই বাড়ী যা। এমন করে' তোর থাকা চলবে না; তোর পেছনে একটা লোক আমি রাখতে পারব না বাপু।

পরেশের শরীরটা এই কয়-দিনেই এত বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, বিছানা ছাড়িয়া একটু উঠিতে গেলেই তাহার মাথা ঘুরিত;—সেদিন সন্ধ্যায় হরিহর তাহাকে একখানা

টিকিট কিনিয়া দিয়া ট্রেণে চড়াইয়া দিল—বলিল, ঘরে গিয়ে চুরি-টুরি করে' কিছু খাস্‌নে যেন পরেশ—একদম উপোস দিবি, বুঝলি ?

হ্যাঁ না কিছু না বলিয়া পরেশ শুধু ঘাড় নাড়িয়া কি যে উত্তর দিল, ভাল বুঝা গেল না।

গাড়ীখানা যখন ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া সশব্দে তাহাদের গ্রামের দিকে ছুটিতেছিল, তখন পরেশ যে কি-রকম উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই অসংখ্য যাত্রীর মাঝে গাড়ীর একটি কোণ ঘেঁসিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল তাহা একমাত্র সে-ই জানে। অতিকষ্টে পথ হাঁটিয়া পরেশ যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

দিদি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, তোর এমন অসুখ, এখানে কি জন্যে এলি ?

পরেশের বড় রাগ হইল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, বেশ করলাম তোর কি ?

পর-সপ্তাহে হরিহর বাড়ী আসিয়া দেখিল, পরেশের ব্যারাম তখনও সারে নাই। অধিকন্তু হাত-পাগুলা ফুলিয়া উঠিয়াছে।

যাইবার সময় স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—ভাইকে ভালবেসে ভালমন্দ কিছু খাওয়াচ্ছ না ত ? মরবে তাহ'লে।

সে বলিল, আ মোলো যা—ভালমন্দ খাওয়াবার সময়টি বেশ! নিজের কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে চব্বিশঘণ্টা অস্থির!

ওকে একবার ডাক্তার দেখালে হতো না, হ্যাগা?

ধ্যেৎ! ডাক্তার না আরো-কিছু! সামান্য অসুখ, তার জন্যে আবার দশ-বিশ টাকা ভাঙি! বলিয়া হরিহর কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল।

তিন চার দিন পরে, একদা অপরাহ্ণে দেশ হইতে হরিহরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কমল হঠাৎ পিতার মেসে গিয়া উপস্থিত হইল।

রাত্রে ছেলেকে লইয়া হরিহর খাইতে বসিয়াছে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল, এটি কে হরিহর-বাবু?

আমার ছেলে হে, বেশ ভাল করে' মাছ-টাছ দাও ওকে। বরং কিছু বেশী লাগে আমি দেবো না-হয়।

বোসো। বলিয়া ঠাকুর ফিরিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, পরেশ যে অসুখ নিয়ে বাড়ী গিয়েছিল, কেমন আছে?

হরিহর বলিল, শুনছি ত কাল রাত্রে সে হয়ে গেছে। আর

বাঁচে ! যে খাবার ধুম ! আবার একথা কখনও শুনেছ ঠাকুর, ওই রোগা মানুষটাকে পোড়াতে দশ মণ কয়লা আর এক-গাড়ী কাঠ খরচ হয় ? যারা শ্মশানে গিয়েছিল, তারা শুনছি আজ সকালে ফিরেছে। হুঁঃ ! ওটা কি আর মানুষ ছিল হে, একটা ভূত ভূত—কোথাকার ভূত এসে জন্মেছিল আর কি !—

শেষ

শ্রীমতীবনলতা দেবী প্রণীত

Approved as a prize book for girls in School & prize & Library

লক্ষ্মীশ্রী

books for Schools in Bengal, No 3765 G
2 B31825 24

তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থ কলেবর প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে কিন্তু মূল্য বাড়ে নাই

এই পুস্তকখানি প্রত্যেক কুল-মহিলার পক্ষে কিরূপ অত্যাবশ্যকীয় তাহা সামান্য বিজ্ঞাপনের দ্বারা বুঝানো অসম্ভব। সামান্য অন্ন-রন্ধন হইতে পোলাও, কালিয়া, মাছ, মাংস, পিষ্টক, সন্দেশ, মিঠাই, আচার, চাটনি, জেম, জেলি, মোরব্বা প্রভৃতি আধুনিক ধরণের খাদ্য প্রস্তুত-প্রণালী বর্ত্তমান সময়োপযোগী করিয়া লিখিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার দেশী ও বিলাতী রন্ধন প্রচলন হইয়াছে তাহার উল্লেখযোগ্য প্রায় ৬০০ শত প্রকার রন্ধনই ইহাতে সহজ ভাষায় বিষদরূপে লিখিত হইয়াছে সে সকল নূতন রন্ধনের বিষয় অপর কোন পুস্তকে নাই।

পাক-প্রণালী বহু আছে—তবে "লক্ষ্মীশ্রী" কিনিবেন কেন? কারণ—

ইহাতে ত সর্ব্বপ্রকার রন্ধন ও জল খাবার তৈয়ারী শিক্ষা আছেই, তদ্ব্যতীত ইহাতে কোনমাসে কি কি আনাজ তরকারী রোপণ করিতে হয়, সর্ব্বপ্রকার ফল ও চারা রোপণ-প্রণালী, সার দেওয়া প্রভৃতি চাষের বিস্তারিত বিবরণ, রোগীচর্চ্চা, রোগীর পথ্য তৈয়ারী, গৃহকার্য্য প্রভৃতি সাংসারিক খুঁটিনাটি, সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা, পিতামাতা শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, গুরুজন, আত্মীয়স্বজন, অতিথি, দাসদাসী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য ও ব্যবহার, পত্রাদি লিখিবার নিয়ম, শিরোনামা লিখিবার নিয়ম, পত্রলিখিবার আদর্শ, জমা খরচ, ধোপার হিসাব, ডিপ্থিরিয়া, হাম, পাঁচরা, কৃমি, দাঁত উঠা, সর্দ্দিকাশি, আমাশা প্রভৃতি চিকিৎসা বিষয়, গৃহশৃঙ্খলা, শিশুপালন রোগীর সেবা, একান্নবর্ত্তী পরিবার ইত্যাদি এত অধিক শিক্ষণীয় বিষয় কুললক্ষ্মীদিগের জন্য আর কোনও বাংলা পুস্তকে লিখিত হয় নাই। একখানি "লক্ষ্মীশ্রী" থাকিলে সংসার লক্ষ্মীশ্রীতে ভরিয়া উঠিবে। প্রত্যেক বধূকে প্রকৃত গৃহিণীতে পরিণত করিবে।

মেয়েদের উপহার দিতে পূজার বাজারে—বিবাহের উপহারে,
স্কুলের প্রাইজে লক্ষ্মীশ্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুস্তক আর নাই।

ইহার কাছে বাজে উপন্যাস কিছুই নহে, ছাপা কাগজ, বাঁধা প্রথম শ্রেণীর, প্রকাণ্ড পুস্তক মূল্য দুই টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থকর্ত্রীর লিখিত দর্পচূর্ণ—১॥০, রত্ন-মন্দির—১॥০, সহধর্ম্মিণী—২৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাণনাথ মল্লিক ও ব্রাহ্ম-সমাজ

শ্রীমতীবনলতা দেবী তদীয়া দাদাশ্বশুরের এই জীবনচরিতখানি লিখিয়া দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় ১০০ বৎসরের পূর্ব্বেকার ব্রাহ্ম-সমাজের ও ব্রাহ্মদিগের বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহা ৫০ বছর পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার ছিল কিম্বা আর কিছুকাল পরে সংগ্রহ করা সম্পূর্ণই অসম্ভব হয় ত হইয়া পড়িত। "প্রাণনাথ মল্লিকের চেষ্টা যত্ন ও উদ্যোগে ইঁহার জ্ঞাতি ও স্বজন মিলিয়া প্রায় ৫০ ঘর বাগআঁচড়া নিবাসী ব্রাহ্মণ, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।" তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যে মহান উপকার ও পুষ্টি সাধন হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজে উপনয়ন সংস্কার ও জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। ৺প্রাণনাথ মল্লিকই ব্রাহ্মদিগের উপবীত ত্যাগের ও বেদীতে বসিয়া অব্রাহ্মণের পক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করার অধিকার সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে আন্দোলন ও বিপ্লব আনয়ন করেন। প্রবর্ত্তকে এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল অষ্টমবর্ষ ২য় সংখ্যা ১১০ পৃষ্ঠা ও ৪র্থ সংখ্যা ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন:—"বাগআঁচড়া হইতেই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। * * * 'প্রাণনাথ মল্লিক একজন অগ্রণী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি কহিলেন উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ * * * কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবু উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কার্য্য করেন কেন?" * * * কথাটা গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাইয়া আঘাত করিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন "যদি ব্রাহ্মসমাজের এই কুরীতি সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে যে সমাজে অসত্যের প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না।" ইহার পরই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করেন। "উপবীতধারী আচার্য্যের ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রহ্মোপসনা বা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, অমনি তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক মহাশয়কে এই কথা লিখিয়া জানাইলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই প্রতিবাদ পত্রে গোঁসাই কেশবচন্দ্রকে ইহাও জানাইলেন যে যদি কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্যগণ উপবীত-ধারী হন, তবে আমি অসত্যের আলয় বলিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিব।" "কেশবচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিবাদ পত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দিলেন। মহর্ষি গোস্বামী মহাশয়ের মতের অনুমোদন করিয়া * * * গোস্বামী মহাশয় এবং অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য মনোনীত হইলে সমাজের আচার্য্যগণের পক্ষে উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ হইল।" এই উপবীত ত্যাগ উপলক্ষে মহর্ষিকে ত্যাগ করিয়া

মেছুয়াবাজারে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। (বিজয়কৃ গোস্বামীর জীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী, সদগুরুসঙ্গ, বিজয় কথামৃত History Brahmo Samaj দ্রষ্টব্য)

. এই বহিতে সেকালের বহু ঘটনার সঙ্গে প্রবীণ লেখক লেখিকাদের লিখিত অ লেখা যোগ করা হইয়াছে যেমন :—প্রাণনাথ মল্লিকের পুত্র রজনীকান্ত মল্লিক স শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখিতেছেন :—"তিনি সহৃদয় ছিলেন, আমাদের সহি সরল ভাবে মিশিতেন, আমরা তাঁহাকে সম্মান করিতাম।" ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রাণন মল্লিকের জামাতা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন রায় বাহাদুর লিখিয় ছেন :—আমার পরম পূজনীয় বন্ধু পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র বাগচি মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই একটি কথা আমার নিকট শুনিতে চাহিয়াছ। আমি আনন্দের সহিত আম পুরাতন স্মৃতির দ্বার উদঘাটন করিয়া এই সামান্য দুই চারি পংক্তি লিখিতেছি।" বহি তখনকার পুরাতন ঘটনা সম্বন্ধে একটি সুদুর্লভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উল্লাসকর মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম-এ মহাশয় প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটন কথা লিখে লিখিতেছেন স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বাগচি মহাশয় আমার সমবয়স্ক ছিলে তিনি আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।......তিনি অতি সরল এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন নিয়মিত ব্রহ্মোপসনাতেও তাঁহার বিশেষ নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।" ইত্যাদি ইত্যা পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, প্রভৃতির প্রবন্ধ ও বহুলোকের চিঠি ইহাতে আছে।

৺প্রাণনাথ মল্লিক ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম উপবীত ও জাতিভেদ প্রথ রহিত করার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব ও ফল আজ হিন্দুসমাজও ভো করিতেছেন। মূল্য ১॥০ টাকা। সব বড় বহির দোকানে ও

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ আফিসে প্রাপ্তব্য